মানুষের মন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬৫

প্রকাশক
অমরেন্দ্র দত্ত
অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

ব্লক ও মুদ্রণ
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

বিভূতি সেনগুপ্ত

বেঁধেছেন
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা—৯

মূল্য—তিন টাকা

সূচীপত্র
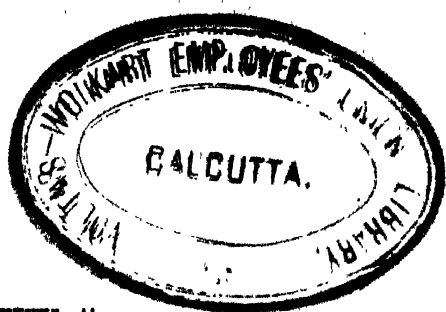
॥ প্রসাদমালা ॥

"—ও চাষকে চে—য়ে নিবারণে— এ মা—ন্দেরী—ভা-ল-ও।"

শ্রাবণের অবিরাম রিমিঝিমি বর্ষণের মধ্যে গোপালের বাপ হরি মোড়ল জল-ভরা জমিতে লাঙ্গল চষিতে চষিতে আপন মনে ওই পুরাতন গানটি গাহিতেছিল, হঠাৎ দেখিল পুত্র গোপালচন্দ্রের হেফাজতের গরুগুলি দিব্য কাল-বরণ বীজ ধানের ক্ষেতে স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিতেছে, আর শ্রীমান কোথায় উধাও। ধেনুচারণ ত ছাড়িয়াছেই—গোপাল বেণুও বাজায় না যে শব্দভেদী গালি নিক্ষেপে হতভাগাকে ফিরাইয়া আনা যায়।

অগত্যা হরি মোড়লকেই গান ছাড়িয়া লাঙ্গল থামাইয়া ছুটিতে হইল। '—উরো গরুটা ঘুরো—রৈ—ঘুরো রৈ—ধানের বীচনে লাগল রৈ—বলি ওরে ও গোপলা রৈ—' বেচারা যায় আর একবার করিয়া পিছন ফিরিয়া হেলে বলদ দুইটীকে অনুরোধ করে, উপদেশ দেয়—'হ—হ বাপধনরা—একটুকু হ,—অ হ; হ বীচ কটার সাবাড় মেরে দিয়েছিল আর খানিকে—হারামজাদা বেটা গেল কোথায়—এই এই-ই ইদিকেই, ওই ওই, কথা শোনে না; নিজের ভুঁই চেন না—গোয়াল ছাড়া গরু, পরের ভুঁই থাকতে নিজের ভুঁয়ে এ্যা?' বলিয়া সপাং করিয়া এক লাঠি গরুর পিঠে বসাইয়া দিল।

শ্রীমান গোপাল তখন সম্মুখের বাগানের ওপাশের মাঠের আইলের উপর বসিয়া ভিজিতে ভিজিতে ঘাস কাটিয়া একটি আট দশ বছরের মেয়ের ঝুড়ি বোঝাই করিয়া দিতেছিল। মেয়েটী বাগানের একটী গাছ তলে বসিয়া হি হি করিয়া কাঁপিতেছিল।

গোপাল ঘাস কাটিতে কাটিতে বলে,—'ভিজে কাপড় নিঙড়ে নাও বেশ ক'রে, অসুখ করবে। মাথার চুলগুলো মোছ, আমার ঐ গামছা নিয়ে সেই ফ্যাটাং ফ্যাটাং করে ঝেড়ে ফেল —যে বড় বড় চুল।'

মেয়েটীর চুল কিন্তু আদৌ বড় নহে; বয়সেব অনুপাতে ক্ষয়া ক্ষয়া চেহারা মেয়েটির, মুখশ্রী নিখুঁত নয়, তবু চটক আছে। নাকটী একটু খাঁদা খাঁদা, কিন্তু তাতেই যেন মানায় বেশী; কপালটী ছোট, চোখ দুটী পটলচেরা নহে—ভীরু চাহনি ভরা ভাসা ভাসা চোখ, মাথার চুল সম্মুখের দিকে বেশ কপাল ঢাকা; কিন্তু লম্বায় খাটো, চুলের প্রান্তগুলি সাপের ফণার মত বাঁকা বাঁকা। প্রবীণা মেয়েরা বলে,—'বয়সে চুল বাড়বে, তারই লক্ষণ; না, ললিতে আমাদের বেশ মেয়ে, বয়েসকালে খাসা ডগ্‌ডগে মেয়ে হবে।' শুনিয়া গোপালের খুসী ধরে না; সে ললিতাদের বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ললিতাকে ভাল করিয়া দেখিবাব জন্য। ললিতা গোপালের বৌ; ন দশ বছরের গোপালের সঙ্গে পাঁচ বছরেব ললিতার বিবাহ হইয়াছিল, সে আজ চাব পাঁচ বৎসরের কথা।

ললিতার বাপ ছিল না, মা তাহাব মেয়েটীকে লইয়া জোত জমায় ধানে, গাই কটীর দুধে, বেশ দুধে-ভাতেই দিন কাটাইতেছিল।

ললিতার মা চিত্তকালী আর গোপালের মা কাত্যায়নী দুজনে সই। ললিতার মা সইকে বলিল, 'গোপালে আর ললিতেতে কি করছে, মজা দেখ।'

কাত্যায়নী হাসিয়া সারা, গোপাল ললিতাকে বৌ সাজাইয়া খেলাঘর পাতিয়াছে। চিত্ত বলে,—'দুটীতে মানিয়েছে দেখ ভাই। তা ভাই সই, ওদের এ খেলাঘবের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।'

কাত্যায়নীও অতি আনন্দে সারা হইয়া বলে,—'বেশ বলেছিস ভাই, খুব ভাল হবে।'

চিত্ত বলে, —'ললিতে আমার চোখের সামনে থাকবে'—বলিতে

বলিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া যায়, রুদ্ধকণ্ঠে সইকে বলে—'ওকে ছেড়ে আমি একদণ্ড থাকতে পারি না সই, মোড়ল যখন গেল তখন বুকে রাবণের চিতা জ্বলে উঠেছিল, ও আমার সেই আগুনে জল দিয়েছে। এ বিয়ে কিন্তু দিতেই হবে, সই।' বলিয়া সইএর হাত চাপিয়া ধরে। কাত্যায়নী বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলে, 'এত ক'রে বলতে হবে কেন ভাই, গোপাল কি তোর পর, ও তো তোরও ছেলে, আমার মতিচ্ছন্ন যদিই হয়, তুই জোর করে দিবি।'

ক্ষণেক পরে কাত্যায়নী হাসিয়া কহে—'সম্বন্ধ ত পাকা হয়ে গেল, এখন বিয়ের পর আমাকে কি বলবি?—সই না ব্যান?' চিত্ত এবার মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে, 'তোমাকে বলবো সই, আর সখাকে বলবো ব্যাই।' কাতু ঝগড়া করে, ঝঙ্কার দিয়া বলে—'মর মর, তোর গরজে ধন্যি যাই, আমার ব্যাই নাই, আবার ব্যান বলতে পাবো না, না ভাই তা হবে না।'

—'না ভাই, সে আমি পারবো না।'

—'আচ্ছা, ললিতে যা বলবে তাই হবে' বলিয়া চার বছরের ললিতাকে কোলে টানিয়া আদর করিয়া বলে—'বলত লক্ষ্মী মা মণি, আমাকে কি বলবে তুমি, সইমা—না শাশুড়ী?'

বাস্তবে যাই হোক না কেন, ছোট ছেলে মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ী নাকি বড় সাধের বস্তু, কল্পলোকে তার বাস, ললিতা আধ আধ ভাবে বলে—'ছাছুলী'।

চিত্ত মেয়েকে বাধা দেয়—'এই, এই, না, বল 'ছাছুলী' না—সইমা।' অবাধ্য মেয়ে কহে—'না ছাছুলী।' কাত্যায়নী বাজী জিতিয়া খুব হাসে। চিত্ত আরও চেষ্টা করে, মেয়েকে ভয় দেখায়—'শাশুড়ী মারে'; মেয়ে বলে—'না, ছন্দেশ দেয়।' কাতুর মন গলিয়া যায়, এতটুকু মেয়ের শাশুড়ী ভক্তি দেখিয়া সে প্রবল উৎসাহে বাক্‌দান করিয়া বাড়ী ফিরিল। বলিল,

—'এই মাঘ মাসেই কিন্তু বিয়ে হবে ব্যান ?'

—'আমাকে আজই বল কেন সই।'

—'আবার সই ? না ভাই তা হলে—'

—'আচ্ছা, আচ্ছা, ব্যান, ব্যান, ব্যান—হল ত ?'

বাড়ীতে ফিরিয়া সেইদিন অপরাহ্ণেই কাতু স্বামীর কাছে কথাটা পাড়িয়া ফেলিল। হরি মোড়ল দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল ; কাতু উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, 'আমি সইকে কথা দিয়েছি, এ বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে, আর এই মাঘ মাসেই দিতে হবে।'

হরি মণ্ডল জাত চাষা হইলে কি হয়, বেশ হুঁসিয়ার লোক, গাঁয়ের লোক কেউ বলিত 'ইস্কুরুপের প্যাঁচ', কেউ বলিত 'জিলিপীর পাক'।

হরি মণ্ডল রাগিত না, হাসিয়া বলিত, 'বাবা, এ সংসারে নিজের গণ্ডা যে বুঝতে পারে সেই মন্দ। তা বল, তোমরা বল, হাম্ কিন্তু নেহি ছোড়েগা, নিজেরটী ষোল আনা বুঝে নেবোই, হ্যাঁ, হ্যাঁ।' কিন্তু বুঝিবার সময় বুঝিত সে আঠার আনা। হরি মণ্ডল পরকে দোষ দিবে কি, তাহার গৃহিণীও তাহাকে মাঝে মাঝে ঐ নামে অভিনন্দিত করিত, অবশ্য সেটা দাম্পত্য-কলহের সময়—তাই বুদ্ধিমান হরিচরণ সেটা গায়েই মাখিত না। স্ত্রীর এই নূতন সম্বন্ধের প্রস্তাবে হরিচরণ কোন কথাই কয় না, সে মনে মনে লাভ লোকসান খতাইয়া দেখে। তা মন্দ কি ? ঐ ত' একমাত্র মেয়ে, ও-ই সমস্ত ক্ষুদ-কুঁড়ার মালিক—আর নেহাত ক্ষুদ-কুঁড়াও ত নয়, বিঘা আষ্টেক দশ ধানী জমি, কাঠা তিনেক বাস্তু, দু তিনটে পুকুরের অংশ, মন্দই বা কি ? গোপালের মায়ের এ নীরবতা ভাল লাগিল না, সে তীব্রসুরে ঝঙ্কার দিল—'বলি কথা কও না যে ?' হাতের ঝাঁটা গাছটার ঘর্ষণ শক্তি যেন বাড়িয়া উঠিল।

হরিচরণ একটু মৃদু হাসিল, ওই হাসি দেখিলে নাকি কাতুর অঙ্গ জ্বলিয়া যাইত, সে ঝঙ্কার দিয়া বলিত—'দেখ, যা বলবে খুলে বল, তা না, আমি মাগী এক ঘর এক পৌটী বকে মলাম, আর উনি মনে মনে জেলাপীর পাক মেরে হাসলেন একটু 'মসনেফুলী' হাসি, মনে হয় হাসির মুখে মারি তিন ঝাঁটা।' আজ আবার সেই গা-জ্বালান হাসি দেখিয়া কাতুর হাতের ঝাঁটা নীরব হইয়া গেল, সে স্বামীর সম্মুখে আসিয়া অতি গম্ভীর ভাবে বলিল, 'বলি হাসছ যে ?'

কথায় সুরে ঝাঁজ থাকিলে মোড়ল টলিত না, কিন্তু আজ কাত্যায়নীর কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে পত্নীর দিকে না চাহিয়া পারিল না—বেচারী চমকিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হাতে ঝাঁটা গাছটা শক্ত করিয়াই ধরা আছে। তাল বজায় রাখিতে হরিচরণ তাড়াতাড়ি কহে—'হ্যাঁ, তা ভাল, তা বেশ ভালই হবে, কন্যেটিও বেশ, সবই পাবে থোবে, আর ব্যা—নটীও বেশ।' কহিতে কহিতে মোড়লের চোয়াল ভরিয়া রসালো হাসি ফুটিয়া উঠিল। কাতু আরও গম্ভীর সুরে বলিল—'কি ?'

মোড়লের মৃদু মধুর হাসির কারণটী ধমক খাইয়া অসতর্ক মুহূর্তে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সম্পত্তির দিকটী দেখিয়া মোড়লের অন্তর্দৃষ্টি পড়িয়াছিল—বেয়ানের উপর। বেয়ানের রূপখানি মনে করিয়া তাহার মুখে মৃদু মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুনরায় ধমক খাইয়া জিলিপীর পাক চট করিয়া একটা পাক ফিরাইয়া শোধরাইয়া লইল—'বা, সই তোমার ভাল লোক নয়।'

মোড়লের নাকি খানিকটা ও দোষও ছিল—তবে কাতি নাকি বড় কঠিন মেয়ে তাই এদিক ওদিক চোখ ফিরাইবার তার জো ছিল না। প্রথম বয়সে কাতু স্বামীকে লইয়া অনেক ভুগিয়াছে, তাই এখন তাহাকে বশে পাইয়া অতি কঠোর বন্ধনে বাঁধিয়াছে।

পুকুর পাড় দিয়া যাইতে যাইতে ঘাটের পানে চাহিলেই সর্বনাশ,—ঘরে ফিরিয়া আসিলে কে আসিয়াছিল খোঁজ লইলেই কাতু অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হানিয়া কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিত—'কেন বল দেখি, তোমার টনক নড়ল কেন?' তাই মোড়ল কথাটা শোধরাইয়া লইলেও কাতি সহজে ছাড়িল না, সে আরও ঝাঁজাইয়া কহিল—'তা এমন রসান দিয়ে, 'ব্যা—নটীও বেশ' বলা হ'ল কেন?'

হরিচরণও বড় ধূর্ত, সে হাসিয়া কথাটা পরিহাসের পর্যায়ে ফেলিয়া এড়াইতে চাহিল—'তা সংসারে ত ব্যাই ব্যান রসগোল্লা পাওয়ার মত—রসের জিনিষই বটে।' কাতুও হারিবার মেয়ে নয়—সে রসিকতার জবাব বেশ একটু গম্ভীরভাবে বাঁকাইয়া দিল—'শুধু রস? তোমার রস গেঁজে তাড়ি হ'য়ে উঠেছে—মদো গন্ধ যে লুকোবার নয় তা জান।'

কে নাকি ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়াছিল কলা চুরি করিতে। অসময়ে দেবতার ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া পথের লোকে—'কে ঘরে' বলিয়া প্রশ্ন করিতে অসতর্ক চোর উত্তর দিয়াছিল—'আমি ত কলা খাই নাই।' মোড়লের এবার হইল তাই, কাতুর গম্ভীর রসিকতায় সত্যই ধরা পড়িয়াছে সন্দেহে বুকের মধ্যে তাহার ঢেঁকি কোটা সুরু হইয়া গেল; সে অতি দুর্বল কৃত্রিম ক্রোধে কাতুর উপরই দোষ চাপাইয়া বলিল—'আচ্ছা ছাঁদ-ধরা বেঁকা মন তোমার, বলে যে, সেই—কেষ্ট বল্লে বাঁধে, রাধা বল্লে ছাঁদে। যা বলব তাতেই দোষ, আবার আমাকে বলে জেলাপীর প্যাঁচ। হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ। ওই হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ করিতে করিতে সে সরিয়া পড়িয়া বাঁচিতে চাহে। কাত্যায়নী পিছন হইতে বলিল—'বলি পালাচ্ছ যে, কি বলছ বলে যাও।'

মোড়ল এতক্ষণে কাতির আঁচে আগুন ঠাওরানর কথাটা ধরিয়া ফেলে, সে ফিরিয়া বসিয়া এক কথায় কথাটা সারিয়া ফেলে, 'তা

তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন আপত্তি করে কি করবো বল?'

তোষামদে দেবতা তুষ্ট, কাতুও সন্তুষ্ট না হইয়া পারিল না, সে হাসিমুখে বলিল—'হুঁকোতে কি টানছ—ধোঁয়া যে নাই—দাও একবার তামুক সেজে দি।'

যাহা হউক দুটী সখীর বাল্যের পুতুল খেলা সার্থক হইল—সই হইতে বেয়ান হইল। কাতু গোপালকে সঙ্গে করিয়া বেয়ানের বাড়ী যায়, গল্প করে, ভবিষ্যতের কত উজ্জ্বল ছবি আঁকে। ওদিকে আঙিনায় গোপালে ললিতায় খেলা করে, ওরাও দুজনে পাথর পুতুল লইয়া ছেলেমেয়ের বিবাহ দেয়—গোপাল ললিতাকে ডাকে ব্যান।

ললিতা উত্তর দেয়—'কি গো ব্যাই।' দাওয়ার উপরে কাতু সইকে ঠেলিয়া দিয়া হাসিয়া লুটাইতে লুটাইতে কহে—'ওই শোন্।' চিত্ত বেয়ানের ঠেলায় পড়িয়া গিয়া পড়িয়া পড়িয়াই হাসে, কাতু ছেলেকে শেখায়—'ব্যান্ বলতে নাই, বৌ, তোমার বৌ।' ললিতার মা ললিতার মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া কহে—'বর তোমার, মাথায় কাপড় দিয়ে লজ্জা করতে হয়।' ছোট্ট ললিতা ঘাড় নাড়িয়া কহে 'বেশ'।

ওদিকে হরিচরণ ছট্‌ফট্ করে; তাহার মনে ছিল বেয়ানের জমিটুকু সদ্য সদ্য আত্মসাৎ করিয়া আপনার চাষ বাড়াইয়া ধানের গোলার পেট মোটা করে। বিধবার একটা পেট, আর ঐ এক ছটাক একটা মেয়ে, হাত তোলা কিছু দিলেই চলিবে। কিন্তু বেচারা কথাটা পাড়িতে পারে না। বেয়ানের কথাও মনে পড়ে কিন্তু সাহস হয় না, পত্নীর মোটা মোটা চোখের খরদৃষ্টি মনে পড়ে। এদিকে চাষের সময় আসিয়া গেল। আপন জল্পনা কল্পনা ব্যর্থ হয় দেখিয়া একদিন কাতুকে সে বলিল—'একটা কথা বলছিলাম—।'

কাতু বলিল, 'বল কেন, আমি কি বারণ করেছি—না শুনবো না বলেছি।'

—'ব্যানকে বল, ভাগ জোতের জমিটা ছাড়িয়ে নিলে হয় না? ভাগ জোতদারের ভাগটা তো বেরিয়ে যায়, আমাদের হালে চষলে সেটা ঘরেই থাকবে।' কাতু কথা কয় না, সে সাত পাঁচ ভাবে।

মোড়ল বলিল—'কি বলছ?'

কাতু বেশ গম্ভীর ভাবে বলিল—'কাজ কি বাপু, ব্যান কুটুম বেশ আছি, আবার জমি নিয়ে ধান নিয়ে গোলমালে কাজ কি? তোমার ফলবে হয়ত পাঁচ মণ, লোকে বলবে দশ মণ বিশ মণ, বলবে মোড়ল ব্যানকে ফাঁকি দিলে। কুটুমের সঙ্গে বিষয় ব্যাপার ভাল নয়, জান তো। ঝক্‌মারী—কুটুমের সঙ্গে বিষয় ব্যাপার!'

মোড়ল বলিল—'তা লোকসানটা বোঝ—।'

—'আমার লাভ লোকসানে কাজ নাই বাপু, ও করোনা।'

—'তুমি একবার বলেই দেখ না।'

কাতু চুপ করিয়া থাকিল, কথা কহিল না—বেয়ানকেও কিছু বলিল না। মোড়ল কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে সুযোগ বুঝিয়া বেয়ানের বাড়ী আনাগোনা সুরু করিয়া দিল। কিন্তু বেয়াই আসিলে কি হয়, বেয়ান যে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বেয়াইকে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রাখিয়া দেয়। বেয়াই কথা পাড়ে—'এখন একটা কথা বলছিলাম ব্যান'। বেয়ান কথার উত্তর দেয় না। আর মোড়লের অগ্রসর হইতে সাহস হয় না, সে ফিরিয়া যায়।

একদিন সে মরিয়া হইয়া মাঝখানে পুত্রবধূকে খাড়া করিয়া কথা পাড়িবার চেষ্টায় কয়টা রসিকতা করিয়া ফেলিল; ললিতাকে উদ্দেশ করিয়া মোড়ল বেশ উচ্চকণ্ঠে কহিল—'তোমার মাকে বলত—মা, বাবা এসেছে।' ললিতা শিক্ষামত তাই বলিল। ঘরের মধ্যে

ললিতার মা মরমে মরিয়া গেল। বাহিরে মোড়ল হি হি করিয়া হাসিতে থাকিল। দীর্ঘ নীরবতায় সে আবার বলিল—'বল, বল বাবাকে দেখে লজ্জা করতে নাই।' বলিয়া সশব্দে হাসে, ভাবে অনেকটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, পিছানো হইবে না।

এবার কিন্তু ভিতর হইতে উত্তর আসে—ললিতার মারফতে; ললিতা বলে—'মা বলছে, সইকে বলে দোব।' মোড়লের হাসির তাল কাটিয়া গেল। পরক্ষণেই আবার হাসিতে হাসিতে দরজা পর্যন্ত আগাইয়া গিয়া বাজু দুইটী ধরিয়া ভিতরে মাথা গলাইয়া বলিল—'তোমার সইএর ভয়ে ত আমি—'

মোড়লের বলিবার উদ্দেশ্য ছিল তোমার সইএর ভয়ে আমি মরিয়া ভূত হইয়া আছি। কিন্তু ঐ আমি পর্যন্ত বলিয়া তাহার আর বলা হইল না! কি একটা শব্দে মুখ ফিরাইয়া ভয়ে সে না মরিলেও যে ভূত হইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ নাই। হাসি বন্ধ হইয়া গেল, কথা বন্ধ, মুখ চোখ বিকৃত হইয়া গেল।

মোড়ল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বাহির দরজায় কাতু সশরীরে বিরাজমানা। তাহার অন্তর আকণ্ঠ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল, তামাকের ধোঁয়া পর্যন্ত বাহির হইতেছিল না। তবু মনে মনে মধুসূদন স্মরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পা দুইটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপে যে। যাই হোক কম্পিত পদে সে বাহিরে পালাইবার চেষ্টায় কাত্যায়নীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে অযাচিত কৈফিয়ৎ দিয়া গেল—'সেই কথাটা ব্যানের সঙ্গে,—তা—তা—না হ'ল—নাই হ'ল, ব্যানকে শুধোও কেন—ঈশ্বরের দিব্যি তা—তা—'

কাতু দেখিল, স্বামী বাহির হইয়া আসিল চিত্তর ঘর হইতে। সে কোন কথা কহিল না, শুধু পলায়নপর স্বামীর দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বেয়ানের ঘরে ঢুকিল। গম্ভীর থমথমে মুখ, বুকের ভিতর ঝড়ের বাত্যা বহিতেছিল।

কাতুর জ্বলন্ত দৃষ্টি ব্যর্থ হয় নাই, পথে মোড়ল উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বার দুই হুঁচোট খাইয়া সোজা শস্যশূন্য জনহীন মাঠে অকারণে গিয়া আঘাতপ্রাপ্ত আঙুলগুলি টিপিতে টিপিতে কৈফিয়তের পর কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করিতেছিল, কিন্তু তাহার কোনটাই মনোমত হইল না, শেষে অতি বিরক্তি ভরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'কি বিপদেই পড়লাম আমি, হা ভগবান!'

এদিকে ললিতা কাত্যায়নীকে দেখিয়া গৃহবর্তিনী মাকে কহিল—'মা মোড়ল পালিয়েছে, শাশুড়ী এসেছে।'

ললিতার মা কন্যার সম্বন্ধ-জ্ঞানের পরিচয়ে আর বেয়ানের ভয়ে বেয়াইএর পলায়নের কৌতুকে একগাল হাসি লইয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু বেয়ানের আষাঢ়ে মেঘের মত থমথমে মুখ দেখিয়া তাহার হাসি শুকাইয়া গেল, তাহার বুকের ভিতর কেমন গুরগুর করিয়া উঠিল, বেয়ান ভাবিয়াছে কি?

গম্ভীর ভাবে কাতি বলিল—'গোপাল আসে নাই?' যতখানি কৃতার্থ-হওয়া হাসি হাসা চলে ততখানি হাসি হাসিয়া চিত্ত বেয়ানকে কহিল—'কৈ না ভাই, তা এস, বস। ললিতা মা, আসন এনে দাও তো শাশুড়ীকে।'

সেই সুরেই কাতি বলিল—'না, বসবো না, ঢের কাজ আছে, সেই মুখপোড়া ছেলের সন্ধানে এসেছিলাম—তা বড় অসময়ে এসে পড়েছি ব্যান, কিছু মনে করো না।' শীতের দিনে জল ছিটানো, আর মিথ্যা অপবাদ নাকি বড় গায়ে বাজে, চিত্তরও বাজিল, কয়েক মুহূর্ত সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল, পরে বেশ শান্ত কঠিন স্বরে কহিল—'না, বড় সুসময়েই এসেছ ব্যান, নইলে আজ হয় ত আমাকে অপমান করে বেয়াইকে তাড়াতে হ'ত। তা ভালই হ'ল, তুমি নিজেই দেখে গেলে, ব্যাইকে একটু সাবধান করে দিও; আর যদি কোন কাজই থাকে, যদি আসতেই হয় তবে তোমাকে যেন সঙ্গে ক'রে নিয়ে

আসে ;—ব্যাই-এর রীত করণ বেশ ভাল নয় ; আজ কদিন থেকেই ব্যাই আমাকে এমনি করে জ্বালাচ্ছে।' কথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য এটা কাতুই সব চেয়ে বেশী জানিত, কিন্তু তবু স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আকারে কথাটা তাহার সহ্য হইল না, সে প্রতিবাদ করিয়া কহিল—'তোমার ঘর তোমার দোর, অবিশ্যি যাকে মন বলতে পার, আমার দোর তুমি মাড়িয়ো না, মাড়ালে ঝাঁটা মারতে পার, গলায় হাত দিয়ে দূরও করতে পার, কিন্তু ব্যাই ব্যানের বাড়ীতে ব্যাই ব্যান আসে, দুটো তামাসাও করে ; তা তোমার কোমল অঙ্গে যখন ফোস্কাই পড়ে তখন আর কেউ আসবে না। আমি ত আসতে দেবোই না, যদি নেহাৎ লুকিয়ে আসে তুমি লোক ঠিক ক'রে রেখো, যেন পা দুটো ঠ্যাঙার ঘায়ে ভেঙ্গে দেয়।'

চিত্ত আর কূল পাইল না, এতখানি বিষ মানুষের জিভে থাকে তাহা তাহার ধারণাই ছিল না, সে স্তম্ভিতের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; কাতু উত্তরের প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যাইবার সময় আর একটা দংশন করিয়া গেল, বিষ তাহার ঠোঁটের আগায় তুফান তুলিতেছিল, সেই বিষ উদ্গার করিয়া কহিল —'এতই যদি পবিত্ততা কাজ কি রূপের আদিখ্যেতা। বলি ঠেঙাই বা চাই কেন, লোককে মানাই বা করতে হবে কেন—নিজে রূপ কমালেই পার। বিধবা মানুষ চুলের পাঁজা না আঁচড়ে কেটে ফেল্লেই পারো, ঠোঁটের আগায় পান দোক্তার পিচ না কাটলেই পারো। লোককে দোষা কেন, বলে শাক দিয়ে যে মাছ ঢাকে না, না ঢাকলে যে মান থাকে না—সেই বিত্তান্ত।'

এত তীব্র বিষ চিত্তর সহ্য হইল না, বিশ্বসংসার তাহার চোখের সামনে যেন ছায়াবাজীর মত নাচিতে লাগিল, আশ্রয়ের জন্য দুয়ারের বাজুটা ধরিতে গিয়া বেচারী ওই বাজুর উপরেই কপাল ঠুকিয়া পড়িয়া গেল। কপাল ফাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল, ললিতা

আর্তস্বরে—'মা,—মাগো' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে ক্রন্দনে ছুটিয়া আসিল গোপাল, সে পাশেই ওঁৎ পাতিয়া ছিল, মা ও শাশুড়ীর কথা কাটাকাটি দেখিয়া ভিতরে ঢুকিতে সাহস করে নাই। দশ বছরের গোপালের চোখে মুখে জল দিবার অভিজ্ঞতা ছিল, না বিধাতা যোগাইয়া দিলেন কে জানে; সে শাশুড়ীর চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। ললিতার মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া গোপালকে বুকে লইয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া আপনার পোড়া অদৃষ্টকে বহু ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে কহিল —'আমি কিসের কাঙালিনী, আমি বৃন্দাবনের পরাণধন কানুর জননী।'

কাত্যায়নী ফিরিয়া যেন কেমন হইয়া গেল, কেমন উদাস মন, স্বামীকে পর্যন্ত কিছু বলিল না। কথাটা লইয়া যে গোল করা চলে না, তাহাতে শুধু ত স্বামীর বা বেয়ানের কলঙ্ক প্রচার হইবে না, তাহার ভাগ্যের কলঙ্ক, নারী ভাগ্যের অতিবড় দৈন্যের কথাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে যে। ভাগ্যের মর্যাদা লোকচক্ষে বজায় রাখিতে হত-ভাগিনীর মত বুকে রাবণের চিতা জ্বালাইয়া সে বসিয়া রহিল। কিন্তু সেই অবরুদ্ধ আগুনের সমস্ত শিখা বেয়ানকে দগ্ধ করিতে একমুখী হইয়া ধাবিত হইল। সে বলিল—'ছেলের আমি ফের বিয়ে দেবো।' মোড়ল মিটিমিটি করিয়া চাহিয়া সায় পুরিয়া সহানুভূতি পাইবার আশায় সোৎসাহে কহিল—'সেই দেওয়াই উচিৎ, বলত কালই আমি—'। কাতু ঝড়ের মত আত্মহারা হইয়া বলিল—'তুমি কথা কয়ো না বলছি, আমি গলায় দড়ি দেবো—'। মোড়ল এবার কুল হারাইল; সে নীরবে কাতুর রোষসমুদ্রে গা ভাসাইয়া দিয়া পড়িয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। কাজ করে, খায়, আর সময়ে অসময়ে কাতুর অভিমান তরঙ্গে হাবুডুবু খায়। এইভাবে ধীরে ধীরে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর

একরূপ আপোষ হইল বটে কিন্তু বেয়ানের সঙ্গে বিরোধ ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিল।

সম্মুখে জামাই ষষ্ঠী, ললিতার মা ষষ্ঠী বাঁটার তত্ত্ব করিল, জামাইকে আনিতে চাহিল। কাতু দ্রব্য-সম্ভারের ডালা বাঁ হাতে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—'মা গো, এই কি তত্ত্ব নাকি, এ যে মুটে মজুরেরও অধম, তারাও যে এর চেয়ে ভাল দেয়। আর ছেলে কোথা তার ঠিক নাই, আজ থেকে শ্বশুরবাড়ী কিসের।' মা গোপালকে পাঠাইল না বটে কিন্তু গোপাল না গিয়া ছাড়িল না। মা তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া ষষ্ঠীতলা লইয়া গিয়াছিল, সে বাড়ী ফিরিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সুট করিয়া এক সুযোগে ললিতাদের বাড়ী গিয়া হাজির।

এমনি করিয়াই দিন চলিতেছিল। বেয়ানে বেয়ানে ঝগড়া বাড়িয়া চলিলেও গোপাল ফাঁকে ফাঁকে শ্বশুর বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিত। সুযোগ বুঝিলেই সুট করিয়া বাড়ী ঢুকিয়া শাশুড়ীর আদর যত্ন লইত, ললিতার সঙ্গে দু'দশটা কথা কহিয়া আসিত, ললিতা যখন মাঠে ঘাস কাটিতে যাইত তখন সে সন্ধানী বেড়ালের মত সেখানে গিয়া হাজির হইয়া ঘাস কাটিয়া দিত, মায়া যত্ন করিত—রোদের দিন গাছের ছায়ায় তাহাকে বসাইয়া নিজে ঘাস কাটিতে কাটিতে কহিত—'আহা ফরসা রং, রোদে তেতে যেন সিঁদুর বন্ন হয়েছে।' ললিতাও ন বছরের মেয়েটি, বর কি বস্তু না বুঝিলেও সে যে লজ্জার লোক তাহা সে বুঝিয়াছে, সে রাঙা মুখ আরও রাঙা করিয়া বলিত—'যাঃ—।'

সেদিন হরি মোড়লের আর চাষ করা হইল না, তাহার শক্ত উপদেশ, শিক্ষা, অগ্রাহ্য করিয়া রক্ষকহীন গরুগুলা ওই নিজের জমির বীজ ধানেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পড়িল; নিষেধও

শুনে না, ধমকেরও তোয়াক্কা রাখে না, মানে শুধু এক পাঁচনী লাঠি। কিন্তু দেড় হাত লাঠিখানি দিয়া সে হেলে বলদ ঠেঙাইয়া চাষ করে, না গরু ফিরাইয়া বীজ বাঁচায়?

অগত্যা বেচারী আপনার গালি গালাজের ভাণ্ডার নিঃশেষে হতভাগা ছেলের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করিতে করিতে হাল খুলিয়া সেদিনের মত গরুর পাল লইয়া ঘরে ফিরিল।

ফিরিতেছিল গালি গুলা চর্বিত চর্বন করিতে করিতে—'হারামজাদা বেটা-শালা-বেটা'। রাগের দাপে সম্বন্ধ বিচার পর্যন্ত ছিল না।

সহসা পিছন হইতে কে হাঁকিল—'মোড়ল, ও মোড়ল।' মোড়ল অতি বিরক্তিভরেই আপন মনে ভ্যাংচাইয়া কহিল—'মোড়-ল, মো-ড়ল, কেরে আমার রোজগেরে পুত, আভাঙ্গা বর্ষার মাঠের মধ্যে কঁ্যাচর কঁ্যাচর, মোড়ল মোড়ল—ই-দিকে মোড়লের কি হচ্ছে তার ঠিক নাই।'

পিছন হইতে আবার হাঁক আসিল—'মোড়ল, ও হরি মোড়-ল।'

অতি বিরক্তিভরে মোড়ল ফিরিয়া দেখে—দূরে জমির মাথায় দাঁড়াইয়া জমিদারের লগ্দী, চৌকিদার, আরও দুইজন লোক—একজন বোধ হয় ঢুলি। মোড়লের আর ফেরা হইল না, সে গরু কয়টার হেফাজতে ভগবানকে নিযুক্ত করিয়া ফিরিল। যাইতে যাইতে বলিল—'হে ঠাকুর, দেখো গরু কটা যেন খোঁয়াড়ে না যায়; কারু জমিতে লাগে ত সে যেন না দেখে—হে ভগবান।'

সে লোক কয়টির কাছে যাইতেই লগ্দী বলিল—'আচ্ছা ভোগান ভোগালে মোড়ল, গোমস্তামশাই আদালতের পিয়াদাকে সঙ্গে দিয়ে বল্লে, যা মোড়লের বাঁশগাড়িটা সেরে দিয়ে আয়; নিজে আপনার ঘরে বসে বেশ হুঁকো টানছে, আর আমি তোমার

বাড়ী গেলাম ত তোমার ছেলের পাত্তা পেলাম না, তারপর ই-মাঠ উ-মাঠ—এবার বাপু পাঁচসিকে—'

মোড়ল পাঁচসিকের গোড়া মারিয়া কহিল—'সে কথা আর বল কেন ভাই, এই দেখ না জমিতে হাল খুলে দিতে হ'ল। হারামজাদা ছেলে গরুর পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে কোথা যে গেল। আজ যা মারা দেবো—'

আদালতের পিয়াদা বলিল—'চল, চল—জমি দেখাবে চল, জলে বাতাসে জমে হিম হ'য়ে গেলাম।'

লগ্দী আপন কথাটা বলিয়া লইল—'বল্লাম যে—যা দাও তাতে এবার হবে না—'

মোড়ল পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল, কথার উত্তর দিল না। কিছু বলিয়া আবদ্ধ হইবার পাত্র সে নয়; যাইতে যাইতে লগ্দী আবার বলিল—'গোমস্তাকে ঘুষ দিয়ে এত ক'রে বল্লাম—আহা, গরীব বিধবার জমিটুকু নিয়ে কি হ'ল বল দেখি? জমিতো তোমার ঘরেই আসতো, তোমার ছেলেই পেতো।'

মোড়ল এবারও কথা কয় না, পেটে খাইতে পাইলে পিঠে সহিত কিনা জানি না, কিন্তু কানে তাহার সব সহ্য হইত। বেয়ানের সহিত মনান্তরের সুযোগ লইয়া সে তাহার জমিটুকু গ্রাসের ব্যবস্থা করিয়াছিল; কাত্যায়নী কোন কথা কহে নাই। গোমস্তা হরি মোড়লের বন্ধু। তাহাকে দিয়া নালিশ করাইয়া নীলামে সে ডাকিয়াছে,—আজ তাহার পূর্ণাহুতি, জমি দখলের দিন।

লগ্দীটাই আবার বলে—'তা বেশ হ'ল, যে কবছর আগে এল তাই লাভ।'

মোড়ল নীরব, কিন্তু আদালতের পেয়াদা বলে—'আর নিজে বেটা জমিদারের লগ্দী যুধিষ্ঠিরের ধর্ম বেটা।'

বাঁকের মুখে বাগানটা পার হইয়া বেয়ানের কয়খানা ক্ষেত; ঐ বাঁকটা সদলে ঘুরিয়া জমিতে নিশান দিতে গিয়া মোড়লের আর কথা ফুটিল না; সেখানে তখন মিলনের ধ্বজা উড়িতেছে। গোপাল ঘাসের বোঝাটা তখন ললিতার মাথায় তুলিয়া দিতেছে। লগ্দীটা হাসিয়াই আকুল, সে বলিল, 'আর বাঁশগাড়ীর দরকার নাই মোড়ল, বাঁশগাড়ী তোমার ছেলেই গেড়েছে;—যাও, বউ বেটা ঘরে তোল গিয়ে, কিন্তু ডিগ্রী তোমার বেয়ানের।'

বরকে দেখিয়া লজ্জা করিতে হয়, একথা চার বছর হইতে ললিতা শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে, আজ এই নিভৃত মিলন, তার উপর স্বামীকে দিয়া ঘাস কাটানো—এই দারুণ লজ্জায় ন বছরের বধূটি ঘাসের বোঝাটি স্বামীর মুখের উপরেই ফেলিয়া দিয়া ঘোমটা দীর্ঘ করিতে করিতে ছুটিল।

গোপালও কনের পিছু ধরিল, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল গোপাল ঠিক পিছু ধরে নাই, ললিতাকে পিছু ফেলিয়া ছুটিতেছে। আদালতের পিয়াদা কহে—'বাজারে ঢোল বাজা—।'

ললিতা মাকে গিয়া বলিল—'আজ শ্বশুর লগ্দী চৌকিদার আর সব লোক সঙ্গে ধরতে এসেছিল, আমি সব ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছি—'

কথাটা চিত্তর বোধগম্য হইল না, সে প্রশ্ন করিল—

'ধরতে এসেছিল—কিরে, কাকে?'

—'আমাদিগে।'

আরও বিস্মিত হইয়া চিত্ত বলিল—'আমাদিগে, কাকে—' ললিতা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—'জানি না—যা—ঘাস কেটে দিচ্ছিল যে—'

আতঙ্কের মধ্যেও মায়ের মুখে পুলকিত হাসি ফুটিয়া উঠিল, হাসিয়া মা বলিল—'কে, গোপাল ?'

ললিতা আবার মুখ ঘুরাইয়া বলিল—'জানি না—যা, কতবার বলব ?'

বলিয়া সে লজ্জায় পালাইয়া গেল—গেল গোয়াল ঘরে গোবর ফেলিতে; কিন্তু ফেলা তাহার হইল না, মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে পালাইয়া আসিল। মা তাহার জিজ্ঞাসা করিল—'কি-রে, কি ?'

মেয়ে মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়াই সারা—মা হাসির কারণ না পাইয়া বিরক্তি ভরে বলিল—'মর্, হাসির মুখে আগুন, কথা নাই বার্তা নাই হেসেই খুন ?'

মেয়ে এবার বহু কষ্টে হাসি সামলাইয়া গোয়াল ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল—'ওই গোয়াল ঘরে।' সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি। মা এবার ধমক দিয়া বলিল—'আবার হাসি, নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেবো। বল,—গোয়াল ঘরে কি ?'

মেয়ে এবার ঘরের বাহির হইয়া পলাইয়া গেল, যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—'নিজে গিয়ে দেখ না, আমি জানি না।'

ললিতার মা সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, গোয়াল ঘরের এককোণে বসিয়া গোপাল। আসিয়া শ্বশুরবাড়ীর গোয়াল ঘরে ঢুকিয়াছিল; বাড়ী যাইতেও সাহস হয় নাই, আর বাপের ব্যাপার দেখিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিতে লজ্জা করিয়াছিল; পিতার হৃদয়ের কুটিলতা তার বুকে বাসা না গাড়িলেও কূট পিতার পুত্র কুটিলতার অর্থ কতক বুঝিতে পারিত; বিশেষ আদালতের পিয়াদা, জমিদারের লগ্দী, চৌকিদার, আর লগির মাথার লাল পতাকা দিয়া বাঁশগাড়ি সে বাপের কল্যাণে কতবার দেখিয়াছে। ললিতার মা অতি স্নেহে বেচারীর হাত ধরিয়া বলিল—'গোয়াল ঘরে কেন বাবা, তুমি

আমার সাত রাজার ধন মাণিক, ঘরদোর সবই যে তোমার ;—আ মরে যাই আমি, জলে মাথা টস্ টস্ করছে, কাপড় ভিজে, এস এস, কাপড় ছাড়বে এস।'

বলিয়া অঞ্চল দিয়া পরম স্নেহে গোপালের মাথা মুছিয়া দিল ; গোপাল কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিল—বাপের লজ্জায়, শাশুড়ীর ভাবী দুঃখে। চিত্ত ভাবিল বাপের চোখে আজ ধরা পড়িয়াছে বুঝি, তাই ভয়ে সে কাঁদিতেছে ; সে বলিল—'ভয় কি, আমি তোমায় লুকিয়ে রাখবো, তোমার বাবা খুঁজেই পাবে না ;—না হয় নিজে গিয়ে ব্যাই-ব্যানের পায়ে ধরে ঘাট মেনে নোব।'

গোপাল এবার বলিল, 'বাবা যে তোমার জমি দখল করে নিলে।'

বিধবার মাথার ভিতর সব যেন গোলমাল হইয়া গেল।

ওদিকে বাহির হইতে হাঁক আসিল—'মুনিব গো'—

ললিতা বলিল, 'মা ছবিলাল এসেছে।'

ছবিলাল ললিতাদের জমি ভাগে চষে, পুরাণো অনুগত লোক। ছবিলাল ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, 'হরি মোড়ল কি কম ঝানু, তখুনি বলেছিলাম—ওগো মুনিব ঠাকরুণ, এ কাজ করো না, কাঁটা গাছে কোল দিয়ো না, হরি মোড়লের ঘরে বিয়ে দিও না, তা তখন শুনলেন না, গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে গো।'

ললিতার মা'র মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—সর্বস্ব-হারা বিধবা শক্তি হারাইয়া গোয়াল ঘরের চালাতেই বসিয়া পড়িল। চোখ দিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল।

গোয়ালের বন্দী গোপালেরও কান্না আসিল ; বাপের নিন্দা, তাও বুকে কাঁটার মত বেঁধে, চোখে জল আসে, আর ওই সর্বহারা স্নেহময়ী বিধবার দুঃখ—সেও বুকে বাজে ; বেচারীর দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল ; স্বস্তির আশায় এখান হইতে তাহার পালাইতে

ইচ্ছা হইতে লাগিল কিন্তু ওই কর্কশভাষী ছবিলালকে ভয় করে। সিক্তদেহেও তার ঘাম ঝরিতে লাগিল। ছবিলাল আবার বলিল—'কাঁদলে আর কি হবে বল, মামলা-ফামলা কর, না হয় ব্যাই-ব্যানের হাতে পায়ে ধর, তাও যে সে শুনবে তা তো মনে লাগে না আমার,—সে হরি মোড়ল—অজগর সাপ গিলতেই জানে, ওগ্‌লাতে জানে না।'

গোপাল আর থাকিতে পারে না, সে চুপি চুপি বাহিরে আসিয়া পালাইতে চাহিল, কিন্তু ছবিলালের নজর এড়াইতে পারিল না। তাহাকে দেখিয়া ছবিলাল তিক্তকণ্ঠে বলিল—'এই যে, ছেলেকে সব খবর নিতে পাঠিয়েছে ; জামাই বলে বিশ্বেস কোরোনা মুনিব, ও সাপের বাচ্ছা সাপ।' গোপাল ফিরিয়া একবার শাশুড়ীর দিকে চাহিল, ললিতার মা কেবল কাঁদে কথা বলে না ; সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল—ছবিলালের কথাগুলো তার কানে গেল—কিন্তু মনে গেল না। গোপাল আর না দাঁড়াইয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল।

ওঘরের দাওয়ায় বসিয়া ললিতা কাঁদিতেছিল, কেন কাঁদিতেছিল সে-ই জানে—চিত্ত ভাবিল আমার কান্নায় কাঁদিতেছে। ছবিলালও ভাবিল তাই ; সে বলিল—'তুমি কাঁদছ কেন দিদি, তোমার লক্ষ্মী তোমারই আছে।' ললিতা বিরক্তি ভরে বলিল—'বেশ, বেশ, তোমাকে আর কর্তাতি করতে হবে না, যাও।'

চিত্ত বলিল—'তাই এখন যাও ছবিলাল, বিহিত যা হয় করবো বৈকি, না হয়—শক্ত লোককে বিনি পয়সায় লিখে দেবো। তা বলে কি ওই চামারকে ঠকিয়ে খেতে দেবো ?'

ছবিলাল উঠিয়া গেল।

মা চোখ মুছিয়া, মেয়েকে বুকে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিয়া

বলিল,—'তা তুই কাঁদছিস কেন মা, আমার হাড় কখানা থাকতে তোর কষ্ট—'

মেয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া অভিমান ভরে বলিল,—'ছবিদাদা ওকে কেন বকলে—তাড়িয়ে দিলে? ও কি করবে?'

মায়ের বুকও বেদনায় টন্‌টন্‌ করে, মনে পড়ে গোপালের চোখের সেই স্নেহ-ভিক্ষু কাতর দৃষ্টি; চিত্ত বলিল—'কাল সকালেই গোপালকে ডেকে আনবি, বেশ,—অমি ছবিলালকে বকবো।' ডাকিয়া আনার প্রস্তাবে ললিতা চোখ মুছিতে মুছিতে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, 'বেশ।'

চিত্ত মেয়েকে বুকে করিয়া সজল মেঘম্লান আকাশের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিল, তাহার কোন অর্থ নাই, কোন ধারা নাই, ওই কুণ্ডলী-আকৃতি মেঘমালার মতই এলোমেলো।

সহসা একটা ঝড় আসিয়া ঐ মেঘমালাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। সন্ধ্যার মুখে গোপালের মা ঝড়ের মত আসিয়া বলিল, 'বের কর বলছি—আমার ছেলে বের কর।' ললিতার মা কিছু বুঝিতে পারিল না, বিহ্বলের মত তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। কাত্যায়নী বলিল—'চেয়ে আছে দেখ, যেন কিছুই জানে না।'

কাতুর সঙ্গে সঙ্গে মোড়লও আসিয়াছিল, সে বলিল—'কেন একটা হ্যাঙ্গামা করবে ব্যান, থানা পুলিশ—সে অনেক হ্যাঙ্গাম, তার চেয়ে দাও, গোপালকে ফিরিয়ে দাও।'

কাতু কত কথাই বলিয়া গেল—'ও আমার ছেলেকে গুণ করেছে; বলি লজ্জা করে না, শাশুড়ী হয়ে জামাইকে গুণ করতে?'

মোড়ল আপন মনেই বিনা অনুমতিতে সমস্ত ঘর খানাতল্লাস করিয়া বেড়াইল, শেষে বিফল হইয়া বলিল—'ব্যান, সত্যি কথা বল, আমার গোপালকে কিছু কর নাইত?'

কাত্যায়নী কাঁপিয়া উঠিল, 'ওরে গোপালরে—গোপালকে আমার খুন করেছে রে।'

ললিতার মা এবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বেশ ধীর ভাবেই বলিল,—'নিজে মা হয়ে, সন্তানের মাকে যে অপবাদ তুমি দিলে, তা যদি সত্যি হয়, তবে ভগবান যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত করেন; আমার ওই একমাত্র মেয়ে—তারও মাথায় করেন। তোমার ছেলে আমার বাড়ীতে এসেছিল, সে তুপুর বেলাতেই চলে গিয়েছে, আমি তাকে জানি না, জানি না, জানি না। এতেও না মান, ললিতার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করছি, আমি জানি না। তাও না মান, যা খুসী হয় তোমাদের কর গিয়ে। থানা, পুলিশ যা ইচ্ছে—কিন্তু আমার ঘরে দাঁড়িয়ে নয়—যাও, আপনার বাড়ী গিয়ে—'

মোড়ল বলিল, 'ব্যান, জোতের সামিল বাড়ী, তোমার জোতের সঙ্গে নীলেম হয়ে গিয়েছে, আমি ডেকেছি, বাড়ী এখন আমার।'

ললিতার মা এক মুহূর্তে ললিতার হাত ধরিয়া তুয়ারের দিকে পথ ধরিয়া বলিল, 'তোমার বাড়ী তোমাদের থাক, আমার গোপাল ভোগ করবে। আমি চল্লাম।'

অন্ধকার রাত্রি, অন্ধকার পথ।

ললিতা কাঁদিয়া উঠিল, চিত্ত অভয় দিয়া বলিল—'ভয় কি মা, মা বসুমতী আছেন বুক পেতে, মাথার উপরে আছেন ভগবান।'

কাতু হাঁকিয়া কহিল—'আমার গোপাল কোথায় আছে বলে যা।'

চিত্ত বাহির হইতেই বলিল—'খোঁজ কর পাবে, আমি জানি না। তবে সে ভালই আছে, আমার মন বলছে সে ভালই আছে।'

মোড়ল বলিল, 'কিন্তু সম্বন্ধের এই শেষ, তোমার মেয়ের ভাতের আশা তুমি ত্যাগ কর।'

দরজার মুখে দাঁড়াইয়া অন্ধকারের মধ্যেই ললিতার মা হাসিল,

সে হাসি সমস্ত না হারাইলে মানুষ হাসিতে পারে না, হাসিয়া বলিল—'ভাতের ভয় দেখিয়ো না মোড়ল, আমার গোবিন্দ আছেন, তাঁরই পায়ে মেয়েকে ফেলে দিয়ে যাবো।'

শ্রাবণের বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি, পিচ্ছিল পথ, বিদ্যুতের ঘন লেলিহান প্রকাশ, বজ্রের গর্জন—তারই মধ্যে স্থান মান হারাইয়া নিঃসম্বল বিধবা কন্যার হাত ধরিয়া গোবিন্দ বলিয়া কোথায় যাত্রা করিল।

ললিতার মার কথাই সত্য হইল, গোপালকে পাওয়া গেল, সে প্রায় মাস দেড়েক পর। সাত আট ক্রোশ দক্ষিণে চন্দনকাঠি গ্রামের নাম করা কীর্তনীয়া প্রেমসুন্দর বাবাজীর কীর্তনের দলে ভর্তি হইয়া সে গান গাহিয়া ফিরিতেছিল। বাবাজীকে বলিয়াছিল—সে অনাথ। বাবাজী দয়া করিয়া তাহাকে বাড়ীতেই রাখিয়াছিল, গান শিখাইত; আসরে গানের সময় বাবাজীর আদেশমত দু'একখানা তালিম দেওয়া গান সে একাই গাহিত।

কৈশোরের সতেজ মধুর কণ্ঠ, উচ্চতর গ্রামে কণ্ঠের স্বভাব-সুন্দর হিল্লোলিত কম্পন, আর কিশোর নায়ক নায়িকার আবেদন নিবেদন —অলকা তিলকা পরা একটী শ্যাম কিশোরের মুখে—লোকের বড় ভাল লাগিত।

গ্রামের একজন কুটুম্ব-বাড়ীতে প্রেমসুন্দর বাবাজীর কীর্তন শুনিতে গিয়া গোপালের সন্ধান আনিয়া দিল। হরি মোড়ল তাঁহার সহিত দেখা করিলে প্রেমসুন্দর বাবাজী হরিচরণকে বলিল— 'তোমার সন্তান নিয়ে যাও ভাই, নিয়ে যাবে বৈকি, গোপাল নইলে আঙিনা মানাবে কেন? তবে তোমার ছেলেকে দল ছাড়িয়ো না, ওর মূলধন আছে, ওর হবে।'

মোড়ল বিচক্ষণ ব্যক্তি; সে তাক বুঝিয়া বেশ বিনয় করিয়া

বলিল—'দেখুন দেখি, আপনার আশ্রয়ে থাকবে, সে ত' ওর ভাগ্যের কথা, তবে কি জানেন, গরীব লোক আমরা, ছুটো বাছুর আছে, আমরা কি রাখাল মান্দের রেখে—হেঁ হেঁ।'

বাবাজী ব্যস্ত হইয়া বলিল—'সে আমি তোমায় পুষিয়ে দেবো—তা না দিলে হবে কেন? যেদিন গাওনা হবে, প্রত্যেক দিন আমি এক টাকা করে দেবো, আর আসরে নিজে গান গেয়ে যা পাবে তারও পাবে বারো আনা, দলে নোব চার আনা। ছ আনা দশ আনা ভাগ নিয়ম।'

বাপের সঙ্গে গোপাল ফিরিয়া আসিল, কপালে তিলক, গলায় মালা, স্বভাবেরও কত পরিবর্তন, মৃদু ধীর, মুখে মিষ্টি হাসি।

ঘরে পা দিতেই মা কোলে করিয়া বলিল, 'একটী কথা সত্যি করে বলবি বাবা?'

গোপাল বলিল—'কি?'

—'তোর শাশুড়ী তোকে পালিয়ে যেতে বলেছিল, নয়?'

—'না।'

—'তবে গেলে কেন?'

গোপাল চুপ করিয়া থাকিল—উত্তর দিল না। মা বলিল—'শাশুড়ী বলেছিল—নয়?' গোপাল আর উত্তর দেয় না—কাতুর সন্দেহ গাঢ়তর হইয়া উঠে, আক্রোশ বাড়ে। সে বলে—'এই আঘনেই তোর বিয়ে দেবো আমি।' গোপাল চুপ করিয়া থাকে। মা ছেলের মনের কথা বোঝে, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া মুখ মুছাইয়া বলে—'ললিতার চেয়ে ঢের ভাল সুন্দর দেখে বিয়ে দেবো, শ্বশুর, শাশুড়ী দেখবি কত আদর যত্ন করবে। আর কাটীর মত শুকনো এককড়ি মেয়ে তার তরে আবার দুঃখ কিসের? বলে—বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশী—রাই হেন কত মিলবে দাসী।'

কিন্তু বাঁশী যে রাধা ছাড়া আর কিছুই জানে না, বলে না; গোপাল সন্ধ্যার মুখে ললিতাদের বাড়ী গিয়া হাজির হইল।

শূন্য পুরী, দুয়ারগুলা কে ছাড়াইয়া লইয়াছে, দ্বারহীন দ্বারপথে দেখা যায় শুধু পুঞ্জিত অন্ধকার। দীর্ঘশ্বাসের মত বাতাস হা হা করিয়া ফিরিতেছে।

গোপাল কিছু বুঝিতে পারিল না, সে এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া ফিরিল, কেহ কোথাও নাই; মানুষের বসবাসের কোন চিহ্ন নাই; শুধু বড় ঘরের দাওয়ায় একটা বিপর্যস্ত খেলাঘর, ভাঙা খোলা, বালির ভাত, শুকনো ঘাসের তরকারী, একপাশে ইট দিয়া ঘেরা খেলার শয়ন ঘরে কাপড়ের টুকরা দিয়া সাজানো দুইটি পুতুল—গোপালের মেয়ে, ললিতার ছেলে। গোপাল বসিয়া সে দুইটি নাড়িল চাড়িল, শেষে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া আসিল। বাহির হইবার সময় কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

কাত্যায়নী ছেলের বিবাহ দিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। কিন্তু সম্বন্ধ আসিলেই ছেলের বাপে মায়ে বিরোধ বাধিয়া যায়।

বাপ বলে—'আমার জোত জমা, ধানচাল, তেজারতি, রোজগেরে ছেলে, আমি সম্মান নেবো না?'

কাত্যায়নী বলে—'আমার অভাব কিসের?—কারু ধারি না, বরং লোকে দশ টাকা ধারে, আমার পাঁচ মরাই ধান—তিরিশ বিঘে জমি, ছেলে রোজগার করে, আমার টাকার দরকার কি? আমি চাই লাল টুকটুকে মেয়ে, একটুকু বড় সড় ছেলে আমার, মুখ নামিয়ে থাকবে, সে হবে না। মেয়ে আমি নিজে দেখব, তবে বিয়ে দোব।'

মা চায় রূপ, বাপ চায় রৌপ্য; অথচ দুটার সমন্বয় কোন ক্ষেত্রেই হয় না। কাজেই পাত্রীপক্ষ ফিরিয়া যায়। কোনটা ফিরায় বাপ, বেশীর ভাগ ফিরায় মা। যদিই কোথাও রূপ রৌপ্য

দুই মেলে তবে গোপালের মার পাত্রী কিছুতেই পছন্দ হয় না—কোন মেয়েকেই ললিতার চেয়ে সুন্দর বলিয়া তাহার মনে হয় না।

এদিকে কার্তিক মাস পড়িতেই গোপাল চলিয়া গেল কীর্তনের দলের সঙ্গে। সংসারে প্রথম প্রবেশমুখে প্রেমেন্দ্রসুন্দর বাবাজী, স্ত্রী, দুটি সন্তান সব একদিনের কলেরায় হারাইয়াছিল। আজ এই সর্ববন্ধন শূন্য প্রিয়দর্শন কিশোরটিকে কাছে পাইয়া বৈরাগীর ক্ষুধাতুর অন্তর যেন কৃতার্থ হইয়া গেল ; আজীবন সঞ্চিত স্নেহধারা নিঃশেষে ঢালিয়া দিল। সে গোপালকে সন্তানের মত স্নেহ করে, শিষ্যের মত শিক্ষা দেয়, এক সঙ্গে খায়, কাছে লইয়া শোয়, মায়ের মত মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, বাতাস করে। সরল পল্লীবাসী বৃদ্ধ অন্তরের প্রেমভক্তি ঢালিয়া ব্রজের কথা, ব্রজের গাথা, ব্রজের কাহিনী বলে, সে গাথা গোপালের বুক চিরিয়া বসে, বলিতে বলিতে বক্তাও কাঁদে, শ্রোতাও কাঁদে—সেই ভাবাবেশের মধ্যে বাবাজী গোপালকে গান শিক্ষা দেয় ; ভাবরুদ্ধ কিশোর কণ্ঠে গান কাঁদিয়া ফেরে—'এ মাহ ভাদর—এ ভরা বাদর, শূন্য মন্দির মোর।'

মানুষ ভাবে এক কিন্তু বিধাতার বিদ্রূপে হয় আর এক। কাতুর সাধ ছিল ছেলের বিবাহ দিয়া বৌ লইয়া ঘর করিবে, সাধ মিটাইবে, লোকের কাছে তার যে বৌ-কাঁটকী অপবাদ রটিয়াছে, তার পাল্টা জবাব সে দিবে, দেখাইবে, সাধ আহ্লাদ মিটাইবে।

কিন্তু বিধাতা বিরূপ ! সাত দিনের প্রবল জ্বরে কাতুকে সুখের সংসার ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে হইল। হরি মোড়ল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া কাতুর রোগ-শীর্ণ মুখখানি ভাসাইয়া দিল। কাতু বলিল—'ছিঃ, বেটা ছেলে তুমি কেঁদো না, আমার দুঃখ কি—তোমার আশীর্বাদে আমার মত যেতে পারে ক'জন ? কিন্তু দেখো,

যেন আর বিয়ে করো না। তুমি আমার, তাতে পরের ভাগ—এ যে আমি ভাবতেও পারি না গো।'

হরি মোড়ল কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—'কখনো আমায় বিশ্বাস করনি, আজ আমায় বিশ্বাস কর।'

কাতুও চোখের জল ফেলিয়া বলিল—'ছিঃ, তুমি ঠাট্টাও বোঝ না, যাবার সময় দুটো ঠাট্টা করে যাই।' কাতুর এমন পূর্ণ সন্তোষ, এত শান্ত, এত স্নিগ্ধ চাহনি মোড়ল কখনও দেখে নাই। সজল চোখে মোড়ল কাতুর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। থাকিতে থাকিতে কাতু বলিল—'গোপালের আমার ভাল দেখে বিয়ে দিয়ো। তার সঙ্গে দেখা হ'ল না—আঃ।' সব নীরব—মোড়ল শুধু কাঁদিতেছিল।

সহসা কাতুর চিৎকার—'ওগো তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি না—গো।' ক্ষীণ অন্তর্ভেদী আর্তনাদ।

কাতুর মৃত্যুতে যে আঘাতটি হরিচরণের বুকে বাজিল তাহাতে বিচক্ষণ বিষয়ী লোকটি আর একটী মানুষ হইয়া গেল। তাহার মধ্যে কোন উদাসীন যেন ঘুমাইয়াছিল—সে জাগিয়া উঠিল। সে চাষ ছাড়িল, জোত জমা ভাগে দিল, খাতককে সুদ ছাড়িল, নীলাম সম্পত্তি ডাকা ছাড়িল, তুলসীর মালা ধরিল, সন্ধ্যায় গোপালকে কাছে বসাইয়া বলিত—'বাবা, একখানা গান গাও।'

গোপাল গাহিত, গান শেষ করিলে প্রায়ই সে বলিত—'সেই গানখানি বেশ, সেই 'সুখের লাগিয়া'।' গোপাল আবার গাহিত 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।' মোড়লের চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িত, সে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল—'হ্যাঁ, গান বটে বাপু, চোখের জল টেনে বার করে।'

গ্রামের গোমস্তা মোড়লের সুখের লোক, সে একদিন মোড়লকে

ডাকিয়া কহিল, 'মোড়ল, একটা নীলেম আছে ভাল, জলের দামে হবে, বুঝেছ।'

হরি মোড়ল হাসিয়া বলিল—'না দাদা, আর দরকার নেই, চোখের জলের দাম বুঝেছি।' হরি চলিয়া গেলে গোমস্তা অপর সকলকে বলিল—'মোড়ল আর বেশী দিন নয়।'

লগ্দীরা বলিল, 'আজ্ঞে না, এখনও ডাঁটো কেমন, আর বয়েসই বা কি?' গোমস্তা বলিল, 'ওরে বেটা, মা গঙ্গা মড়া আনে কখন জানিস, যখন শেয়াল কুকুরে হেঁটে পার হয়। মোড়লের যখন বিষয়ে অরুচি তখন আর বেশি দিন নয়।'

গোমস্তার কথাটাই ফলিয়া গেল, ছয় মাসের মধ্যে চল্লিশ বছরের জোয়ান, গায়ে অসুরের শক্তি, পাথরের মত চওড়া বুক, সে হইয়া গেল ষাট বৎসরের বৃদ্ধ। শুভ্র কেশ, রেখাঙ্কিত মুখ, হাড় মোটা ভারী দেহখানা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—যেন দেহ ভার আর বহিতে পারে না। যেন হঠাৎ ভূমিকম্পে ফাট ধরা বিরাট দেউল।

লোকে বলে—'আহা, পরিবারের শোকটা বড় লেগেছে।'

বন্ধুরা বলে—'কে জানে বাবা, এত ভালবাসা? ইদিকে নজরও বেশ খবর ছিল।' সত্যই হরিচরণ জানিত না সে কাতুকে এত ভালবাসিত; কাতুও হয়ত জানিত না। ওই জীর্ণ দেহে আট মাসের মধ্যে মোড়লও চলিয়া গেল। গোপাল রুগ্ন পিতার শয্যাপার্শ্বে অবিরাম বসিয়া সেবা করিত, ওষুধ মাড়িয়া বলিত—'বাবা, ওষুধ।'

—'আঃ আর ওষুধ নয় বাবা, এখন ছুটো নাম শোনাও—তোমার মিষ্টি গলার নাম—'

গোপাল কাঁদিতেছে দেখিয়া, মোড়ল তাহার দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহে—'কাঁদছ, তবে দাও ওষুধ।' কতদিন আবার সান্ত্বনা

দিয়া বলিল—'ওরে ক্ষেপা ছেলে, তোকে পরখ করছিলাম, দেখছিলাম তুই আমাকে কত ভালবাসিস। দে, দে, ওষুধ দে।' সহসা এক দিন অসুখ বাড়িয়া উঠিল। সে যেন বিভ্রান্ত, গোপালের দিকে চায় নাই, গোবিন্দের নাম করে নাই, সে নাম শুনিতেও চায় নাই; শুধু বুলি ধরিয়াছিল—'এলে এলে, কাতু এলে? যাই—যাই কাতু—কাতু।' শুধু ঐ 'কাতু' 'কাতু' করিতে করিতেই মোড়ল চলিয়া গেল।

চৌদ্দ বছরের গোপাল সর্ব আশ্রয়চ্যুত হইয়া বিধাতার দেওয়া ওই পরম আত্মীয়টী, ওই প্রেমসুন্দর বাবাজীকেই আঁকড়াইয়া ধরিল। বাবাজীও পরম স্নেহে তাহাকে বুকে টানিয়া লইল; শুধু টানিয়া লইল না, মৃগ-মায়াচ্ছন্ন ভরতের মত বৈরাগী গোপালের মায়ায় বিষয়-বিষের নেশায় বিভোর হইয়া উঠিল।

বাবাজী এখন গোপালের ঘরে আসিয়া গোপালের দেনা পাওনা দেখে, ধানের হিসাব করে—নানা রকম বে-হিসাবী কথাকথি করে; কৃষাণ আসিয়া কাস্তের দাম চাহে—'ধান কাটতে কাস্তে চাই, ছ'আনা করে দাম চাই।'

বাবাজী রাগিয়া আগুন—'বটে, ধান কাটবি তোরা, আর দাম দেবো আমি? বটে রে, আমাকে ঠকিয়ে নেবার মতলব।'

কৃষাণ বেচারী কিছুতেই বুঝাইতে না পারিয়া মধ্যস্থ মানে; মধ্যস্থ বলিল—'হ্যাঁ বাবাজী তাই নিয়ম, তোমাকেই কাস্তের দাম দিতে হবে।'

বাবাজী বলিল—'ও অন্যায় নিয়ম, ধান কাটবে ও, আর দাম দেবো আমি। বাঃ, ঘোল খাবেন শম্ভুনাথ আর কড়ি গুণবেন কেষ্ট দাস।'

নিজেও এখন কাহাকে কখন টাকা দেয়, তাহা আর দেওয়ালের

গায়ে খোলায় দাগ লেখা থাকে না—একটি লাল খেরুয়া কাপড়ের মলাট দেওয়া পাকা খাতায় কালির আখরে লেখা হয়—তবে জমা খরচের ঘরে গোলমাল হয়, ডাইনে জমা—বাঁয়ে খরচ হইয়া যায়।

খাতক খাতা দেখিয়া বলে, 'পাওনা যে আমারই বাবাজী।'

বাবাজী তাড়াতাড়ি খাতাখানা উল্টাইয়া বলে, 'কেন, কেন—হিসেবে ভুল হয়েছে নাকি, তা তুমি ধর্ম চেয়ে বল কেন, ধর্ম চেয়ে বল কেন?'

বাবাজী গোপনে ও-পাড়ার যোগী সরকারকে ডাকিয়া জমা খরচের ধারা শেখে। পাকা খাতাটারই এক জায়গায় লিখিয়া রাখে, বাঁয়ে জমা ডাইনে খরচ; সেটা মনে মনে মুখস্থ করে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিয়া সে জমা খরচ খতায়, টাকার অঙ্কের পুষ্টি দেখিয়া তুষ্টি বাড়ে, মৃদু হাসিয়া ঘুমন্ত গোপালের কিশোর মুখখানির দিকে গভীর স্নেহে তাকাইয়া থাকে।

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া যায়, দলের পাঁচ জনে বলে, 'মূল গায়েন, এবার গোপালের বিয়ে দেন।'

—'হ্যাঁ বিয়ে দিতে হবে বৈকি, এই আর বছর খানেক যাক, দেখি যদি প্রথম বৌমার খোঁজ পাওয়া যায়, আর ততদিন হতে না হতে গলাখানাও দাঁড়িয়ে যাবে।'

রামপদ একটি সম্বন্ধ আনিয়াছিল, সে বলিল, 'ওর মা তো আবার বিয়ে দিতেই বলে গিয়েছে, সে বৌকে ত একরকম ত্যাগই করে গিয়েছে তারা।'

বাবাজী জিব কাটিয়া বলিল, 'রাধে, রাধে, তা কি হয় রামপদ? গোপালের মায়ের যে নিষেধ সে হ'ল অভিমান, সখীর উপর সখীর অভিমান—ওর অর্থ কি আমরা করতে পারি? ও অভিমানের অর্থ, ওই অভিমানী ছুটী জন ছাড়া কেউ করতে পারে না, রামপদ।'

গোপাল ঘরে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, বহুদিন পরে আজ তাহার উজ্জ্বল ভাবে ললিতাকে মনে পড়িল। বিপদে সম্পদে গানের মধ্যে দিন কাটিতে কাটিতে ললিতার সেই ছোট ছবিখানি সে ভুলিতেছিল ; আজ বাবাজীর কথায় তাহাকে মনে পড়িয়া গেল। একটা অদৃশ্য ছবি কোথা হইতে কেমন করিয়া জাগে তাহার মনে কে জানে—তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল যেন ললিতাদের সেই দ্বারশূন্য দ্বারদেশে অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল ম্লানমুখী ললিতা !

রাত্রে বাবাজী গোপালকে জিজ্ঞাসা করিল—

—'গোপাল—'

—'বলুন।'

—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বাবা, বেশ ভেবে চিন্তে উত্তর দিয়ো।' গোপাল চুপ করিয়া থাকে প্রশ্ন শুনিবার প্রত্যাশায়। বাবাজী বলিল—'তোমার মত না নিয়ে ত আমি কিছু করতে পারি না।'

—'কি বলুন।'

—'লোকে বলছে, ললিতা-মাকে গ্রহণ করতে নাকি তোমার মায়ের নিষেধ আছে।' বাবাজী উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া বাবাজী আবার বলিল, 'তোমার সংসার পাতবার সময় হয়েছে, এখন কি করবো আমি ? নতুন সম্বন্ধ দেখব কি ?'

এবারও কোন উত্তর আসিল না।

—'না, ললিতামায়ের সন্ধান করব বল।'

গোপাল যেন নড়িল চড়িল, কিন্তু উত্তর দিতে পারিল না ; অগত্যাই বাবাজী কথাটা চাপা দিয়া আপন মনেই হিসাব করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—গোপালের অভিপ্রায় কি ? বাবাজী

ভাবিল—বালকবালিকার বন্ধন, কোমল মালার ডোর, দীর্ঘ দিনে জীর্ণ হইয়া খুলিয়া গিয়াছে, খেলাঘরের স্মৃতি খেলাঘরের ধূলায় চাপা পড়িয়াছে, ক্ষুদ্র বালিকার ধূলি-ধূসর ছবি আজ আর ঐ কিশোরকে ভুলাইবে কি দিয়া ? তবে তাহাই হোক। কিন্তু সে বালিকা—আহা! ও দিকে গোপালের ঘুমন্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল, জড়িত কণ্ঠে কি বলিল বুঝা গেল না, সদ্য-মনে-পড়া ললিতা আজ স্বপ্নেও দেখা দিয়া গেল। বাবাজী ডাকিল, 'গোপাল! গোপাল!'

গোপাল উঠিয়া বসিল, বাবাজী প্রশ্ন করিল—'স্বপ্ন দেখছিলে ?' গোপাল স্বপ্নের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লজ্জায় ললিতার কথা বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া থাকিল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া গোপাল বাবাজীর অপেক্ষায় সম্মুখের আঙিনায় বসিয়া আপন মনে মাটিতে কাঠি দিয়া দাগ কাটিতেছিল। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবাজী ফিরিয়া আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—'আজ একবার বাড়ী যাব।'

বাবাজী তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল—'বাড়ী যাবে ?—এই বর্ষায়—'

—'বাড়ী যেতে মনে হচ্ছে, আর চাষ আবাদের সময় একবার যাই।'

—'যাও, তবে বেশি দিন থেকো না।'

'দিন পাঁচ ছয় হ'বে' বলিয়া গোপাল চলিতে আরম্ভ করে ; বাবাজী বলে, 'দাঁড়াও, যাবে সেখানে, টাকাকড়ি কিছু নিয়ে যাও।' চারিটি টাকা আনিয়া বাবাজী গোপালের হাতে দিল, সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়িল গোপালের কাপড়ের পোঁটলাটা, মস্ত বড় হইয়া পড়িয়াছে, হাত বাড়াইয়া বাবাজী বলিল—'দাও, কাপড়গুলো গুছিয়ে বেঁধে দি। এ যে একটা বস্তা হয়ে পড়েছে।'

গোপালের হাত হইতে পোঁটলাটা লইয়া খুলিয়া দেখিল, না,

গুছাইয়া দিবার কিছুই নাই ; তবে কাপড়ের সংখ্যাধিক্যে আকার বড় হইয়া পড়িয়াছে। ভাল জামাটি, মিহি ধুতি, আয়না, চিরুণী, সাবান—গরদের চাদরখানি পর্যন্ত, তা ছাড়া আট-পৌরে কাপড় ক'খানা।

গোপাল চলিয়া গেল, বাবাজী মাটির পানে চাহিয়া ভাবিল কত কি ;—হয়ত আর আসিবে না, হয়ত রাগ করিয়াছে, অকস্মাৎ অন্যমনস্ক চোখের দৃষ্টিতে ভাসিয়া গেল গোপালের আঁকা কত রেখা, লেখা, কত কি—তাহারই মাঝে লেখা—কয়েকবার সযত্নে লেখা, ললিতা, ললিতা। বাবাজীর চিন্তা ঘুচিয়া গেল ; সহসা সে আপন মনে গুণ গুন করিয়া গান ধরে—

'পিরীতি বলিয়া তিনটী আখর ভুবনে সৃজিল কে !'

গোপাল গেল ললিতার সন্ধানে ললিতার মামার বাড়ী। ললিতার মামা কহিল—'হ্যাঁ, তা এসেছিল বটে, তা সেই দিনই তো চলে গিয়েছে ; তারপরে সেই দিন রাত্রে না বলা করে কোথা যে গেল, কি করে জানবো বল ? তা ব'স জল খাও।'

গোপাল হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল—বড় আশা করিয়া সে আসিয়াছিল।

বাড়ীর ভিতর গিয়া মামাশ্বশুর বলিল—'ওগো শুনছ, ভাগিন জামাই—ললিতের বরগো, এসেছে—এদের খোঁজে, তা জল খেতে দাও দেখি।'

ললিতার মামী বলিল—নারী কণ্ঠ হইলে কি হয়, সরমে নরম কি নিম্ন নয়, বেশ সতেজ সুস্পষ্ট—'কে ?—কে এসেছে ? সেই চামারের বাচ্চা ? কেন ? কি মনে করে, তার ত কিছু নাই আর—আবার খোঁজ কেন ? এবার ধরে জেলে দেবে না কি ?'

ললিতার মামা মামীর মত এত তেজস্বী নয়, তাহার একটু লজ্জা

হইল, সে চাপা গলায় বলিল, 'চুপ কর, চুপ কর, হাজার হোক কুটুম্বের ছেলে।' উত্তরে ঝঙ্কার উঠিল—'কুটুম তা হয়েছে কি? মাথা কিনে রেখেছে না কি? মাথা কিনে রেখেছে না কি? খাতির কিসের, আমি বলে গুরুর খাতির করি না, ষোল আনা বলে যাই—তা কুটুম কুটুম আছে, আপনার ঘরে আছে।'

—'নিজের ঘরের মানুষ কি কুটুম্ব হয়, পরের ঘরেই মানুষই কুটুম্ব হয়।'

—'যাও যাও—বকো না বেশি, যাও দুপয়সার বাতাসা কিনে আন—যাও, এই দুয়ারে যাও।'

বাহিরে বসিয়া গোপাল সবই শুনিল। মামী শ্বাশুড়ীর কথায় তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

সে আর বাতাসার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে পারিল না, বেচারী জুতা জোড়াটী হাতে করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল।

তাই বলিয়া ওইখানেই ললিতার সন্ধান সে শেষ করিল না, কোথায় ললিতার মাসীর বাড়ী, কোথায় পিসির বাড়ী, এমন কি ললিতার মায়ের মামার বাড়ী পর্যন্ত খোঁজ করিল, কিন্তু ললিতার সন্ধান মিলিল না। শেষে মাস দেড়েক পরে ম্লান মুখে একদিন আসিয়া বাবাজীর সদা প্রসারিত উদার স্নেহময় বক্ষে ফিরিয়া ক্লান্তি ও হতাশায় এলাইয়া পড়িল।

বাবাজী সব সন্ধান রাখিত। ইহারই মধ্যে সে কয়বার লোক মারফৎ গোপালকে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহার কুশল বার্তা লইয়াছে, আজ সে গোপালকে বুকে লইয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—'দুঃখ করো না;—এই মাসেই তোমার আবার বিয়ে দেবো আমি।'

আজ আর গোপালের মুখ লজ্জায় বন্ধ রহিল না, সে বলিল—

'না, বিয়ে আর করবো না আমি।'

সে স্বর লজ্জায় দুর্বল নয়, অভিমানে উচ্ছ্বসিত নয়, রোষে দীপ্ত নয়—সহজ সরল, সবল দৃঢ় ; বাবাজী তাহার মুখপানে চাহিয়া পরম স্নেহে সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল, কোন প্রতিবাদ করিল না। তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যায় নিজে খোল ধরিয়া কহিল, 'গাও তো বাবা—বঁধু কি আর কহিব আমি।'

গোপাল গাহিল—'জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণ-বঁধু হ'য়ো তুমি।' গানে সে ডুবিয়া গেল, শুধু সেই দিন সন্ধ্যার সময় নয়—তারপর হইতে বরাবর।

দীর্ঘ চারি বৎসর পর—।

গোপালের অদৃষ্টে স্নেহের নীড় স্থায়ী হয় না, একটা আকস্মিক ঝড়ে উড়িয়া যায়। বাবাজীও ইহার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। আপনার যথাসর্বস্ব, মায় দলটী পর্যন্ত গোপালকে দিয়া সমাধি-লাভ করিয়াছে। গোপাল এখন দল চালায়, বাবাজীর ডাহিনের দোহার কেষ্টদাস তাহাকে চালাইয়া লয়। বাবাজী তাহাকে বলিয়াছিল—কেষ্টদাস, গোপালকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, তুমি ওকে দেখো। সে কথা সে রাখিয়াছে।

এমনি সময়ে একদিন ললিতার সন্ধান মিলিল,—মিলিল নয়, সন্ধান আসিল ; ললিতার মা নিজে সন্ধান করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় শুইয়া লতিকা গোপালকে স্মরণ করিয়াছে। লিখিয়াছে—

'বড় মনস্তাপে ঘর সংসার সব হারাইয়া কলিকাতায় এক বড়লোকের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিয়া এতদিন গিয়াছে। আজ আমি রোগশয্যায় পড়িয়া, বোধহয় দিন আর নাই ; তোমাকে লিখিতেছি, এখন তুমি ললিতার ভার গ্রহণ কর। যদি তাহাতে তোমার বাপ মায়ের আপত্তি থাকে তবুও একবার আসিও। ভয়

নাই, জোর করিয়া মেয়ে আমি গছাইয়া দিব না, কেবল তোমাকে একবার দেখিবার সাধ, তাই মিটাইব; তুমিতো আমার ললিতা হইতে ভিন্ন নও।'

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিল। কেহ বলিল—'একেবারে খাস কোলকাতায়, ও বাবা খাঁটী নাম লিখিয়েছে, তুমি দেখে রেখো।'

কেহ বলিল—'না হে না, কোলকাতায় সব গুপ্ত বেবসা করে, বুঝেছ। দিনে করে দাসী বিত্তি, রাত্রে—কি যে বলে হে—দিনেতে অশ্বিনী রাত্রিতে রমণী—' বলিয়া আপন রসিকতায় আপনি হাসিয়া সারা হইল।

আর একজন বলিল—'ঠিক বলেছ তুমি, আমি চাকরী করতে গিয়েছিলাম একবার কোলকাতা, দেখেছি সব খোলার ঘরে থাকে—দিনে ঝি আর রেতে—চুলটুল বেঁধে বুঝেছ, পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি যাদের বাড়ীতে চাকর ছিলাম বুঝেছ, তাদেরই বাড়ীতে একটা ঝি ছিল ঐরকম—বাবা দিনে যদি একটা হেসে কথা বলেছি তো এই মারে তো ঐ মারে। আর শালা সেই দিনই কি সন্ধ্যা রাত্রে তার বিবি মুত্তি নজরে পড়ল। বল্লাম ভাই আমি দু'কথা—তা ঠোঁট উল্টে বল্লে কি জান, বলে—যাঃ যাঃ, বকিসনে। দিলাম ভাই এক চাঁদির জুতো মেরে মুখে, আর অমনি হাসি রস দেখে কে।'

অমনি আর একজন তার রসের কাহিনী বলে, তারপর আর একজন—যার সত্য কিছু না আছে সে বানাইয়াও বলে। যাই হোক ললিতার মা কয়দিনে আলোচ্য বস্তু হইয়া পড়িল।

গোপাল কিন্তু কাহারও কথা শুনিল না—পাঁচ জনের কথায় তাহার কিছু যায় আসে না, সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

ভবানীপুরে প্রাসাদ তুল্য বাড়ী, সম্মুখে খানিকটা বাগান,

সামনে রেলিং দিয়া ঘেরা ফটক—গোপালের বাড়ীতে ঢুকিতে সাহস হইল না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া সাতপাঁচ ভাবিল ; বাড়ির একটা কেহ বাহিরেও আসে না যে সন্ধান জিজ্ঞাসা করে।

বাগানের মধ্যে সহসা একটী ছোকরাকে দেখা যায়, বেশ বাগানো চুল, পরনে মিহি ধুতি, গায়ে জালি গেঞ্জি। ছোকরা ছুটিয়া আসে, তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসে একটি মেয়ে, কপাল ঢাকিয়া বিন্নাস করা এক পিঠ চুল, অৰ্দ্ধেকটা তার আবৃত, উজ্জ্বল মাজা রং, নিটোল স্বাস্থ্য-ভরা দেহ, উজ্জ্বল চঞ্চল চোখ ; মোট কথা মেয়েটির রূপ আছে, ত্বরিতগমনে সে নিটোল দীঘল দেহ হেলিয়া তুলিয়া উঠে। যেন একটা হিল্লোল বয়, রূপ যেন জ্বল জ্বল করিয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে সে ভাব দেখিলে বলে—'যেন ধর ধর ভাব—' গোপাল মুগ্ধ হইয়া দেখিতে চাহিল, কিন্তু লজ্জায় পারিল না। ছোকরাটি বাহিরে আসিল, মেয়েটি ভিতর হইতেই বলিল—'ভাল হবে না বলছি, ভাল হবে না!'

ছোকরাটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল—'মাইরি বলছি, এই শেষ তা হলে।'

ছোকরাটী এবার কাছে গিয়া বলিল—'কি বলছিস বল—'

—'কমলা চারটে, নাসপাতি, আঙ্গুর, আর সেই এক শিশি, লক্ষ্মীটি এনো—বেশ!'

—'সেই কি?'

—'স্নো।'

—'টাকা?'

—'তুমি দিও, না হয় আমাকে দিলে।' বলিয়া হাসিয়া মেয়েটি আঁচল হইতে খুলিয়া দুটী টাকা দেয় ; ছোকরাটী বলিল—'এত সব কি হবে? তোর বর আসবে বুঝি?'

ছেলেমানুষের মত মেয়েটী আবদার করিয়া বলিল—'এই দেখ, এইবার ঢেলা ছুঁড়ে মারবো বলছি।'

'আসবে ত একটা চাষা মানুষ—তার জন্যে আবার—'

মেয়েটী তাহাকে কিল উঠাইয়া সহসা বলিল—'ওমা এ কে গো, এ মুখপোড়ার দেখো দেখি'—বলিয়া গোপালকে দেখিয়া সে সরিয়া যায়, যাইতে যাইতে বলিয়া যায়—'কপালে তেলক কাটার ছটায় ছিরি হয়েছে দেখ—আ মরি মরি!'

ছোকরা আপনার পথ ধরে, গোপাল বলিল—'মশায়, এইটী কি ৬৪নং বাড়ী?'

— 'হ্যাঁ, কেন?'

—'এ বাড়ীতে তারাচী গাঁয়ের চিত্তকালী বলে একটী মেয়ে থাকে—ঝি?'

—'থাকে, তার ত অসুখ—।'

—'হ্যাঁ, সেই খপর পেয়েই আমি তাকে দেখতে এসেছি—'

ছোকরাটী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'তোমার কোথা বাড়ী?'

—'আমার বাড়ীও ঐ তারাচী গ্রামেই—'

—'ও!' বলিয়া ছোকরাটী পিছন ফিরিয়া চলিয়া যায়, যাইতে যাইতে বলিয়া যায়—'ভেতরে যাও, দেখা হবে।'

ছোকরা যেন হাসে, গোপালের গা-টা জ্বলিয়া যায়।

সন্ধান করিয়া শাশুড়ীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখিল চিত্তর রোগশীর্ণ দেহখানা শয্যার সহিত যেন মিলাইয়া গিয়াছে; আর মাথার শিয়রে বসিয়া সেই মেয়েটী। সে তাহাকে দেখিয়া মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিয়া উঠিয়া গেল। এই ললিতা—?

গোপালের মনে পড়িল ক্ষণপূর্বের ছবিটা, তাহার বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া

গেল, তন্দ্রাচ্ছন্ন চিত্ত কিছু জানিতেও পারিল না। বাহিরে বারান্দার ওপাশে গিয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—'শোন!'

গোপাল ফিরিয়া দেখিল সেই মেয়েটী, এবার সে সাহস করিয়া তাহাকে দেখিল। তার চোখ আর ফেরে না। তাহার মনে পড়িল গাঁয়ের মেয়েরা বলিত—'না, ললিতে আমাদের বেশ মেয়ে, খাসা ডগডগে মেয়ে হবে।'

কিন্তু এত বেশ! এত ডগ ডগে! এত সুন্দর!

মনের দাহ তাহার এ মোহ ভাঙিয়া দিল, সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'তুমি—ললিতা?'

—'হ্যাঁ, তা চলে যাচ্ছ যে কাপড় চোপড় নিয়ে?' সে যেন কৈফিয়ৎ চায়; গোপালের এ সুরটী বেশ লাগিল কিন্তু সে কথা কহিতে পারিল না। ললিতা আবার মুখটি টিপিয়া হাসিয়া বলিল, —'মুখপোড়া বলেছি, তেলকের নিন্দে করেচি বলে রাগ হচ্চে বুঝি?' বলিয়া কাপড়ের বোঁচকাটা ধরিয়া টান দিল। কিন্তু গোপাল সেটা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল—'না থাক।'

ললিতা সেটা ছাড়িয়া দিল, গোপাল আবার যাইতে আরম্ভ করিল—কিন্তু মনের দাহ আর সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না, সহসা ফিরিয়া সে তপ্ত কণ্ঠে বলিল—'ও ছোকরা কে—?'

ললিতার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে গম্ভীর ভাবে বলিল—'এ বাড়ীর চাকর, আমার মায়ের ধর্ম বেটা।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোপাল যেন কতকটা আরাম পাইল, সে বলিল—'তোমার ভাই?'

—'হ্যাঁ আমার ধর্ম ভাই। আমরা এখানে এতটুকু থেকে আছি।' লজ্জায় গোপালের মাথাটা নুইয়া পড়িল, মনে তাহার গ্লানির সীমা রহিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। ললিতাও

এমন মেয়ে সে আর ফিরিয়া ডাকে না। কতক্ষণ পর ললিতা বলিল—'চলে যাবে নাকি ? আমাকে নেবে না ?'

গোপাল মুখ তুলিয়া চাহিল, সে মুখ দেখিয়া মুখরা চঞ্চলা ললিতারও একটা মোহ আসিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—'এস।'

চিত্তর শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গিয়া গোপাল ডাকিল—'মা—'। চিত্ত গোপালকে দেখিয়া কাঁদিল, সে ধীরে ধীরে গোপালের কথা শুনিল, আপনার অদৃষ্টের কথা বলিয়া বলিল—'তা বলে ভেবো না বাবা, আমি ব্যাই ব্যানকে অভিসম্পাত করেছি, কি দোষ দিইছি। আমার অদৃষ্টের দোষ। মনে বড় ধিক্কার হয়েছিল। অন্ধকার রাত্রে ভাই-এর বাড়ী গেলাম, ভাজ অকথা কুকথা বলে খেতে দিলে, চোখের জলে মুখের গ্রাস নষ্ট হয়ে গেল, সেই রেতে উঠে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এই বাবুদের আশ্রয়ে এসে দাসী বিত্তি করেও সুখে দিন কটা পার করেছি, এখন বাবা তোমার গচ্ছিত ধন তুমি নাও—আমায় খালাস দাও।'

ও দিকে মাথার শিয়র হইতে গচ্ছিত ধন উঠিয়া পলায়ন করিল, গোপাল মুগ্ধদৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া দেখিল ত্বরিত গমনে দেহখানি স্বভাব সুন্দর ললিত ভঙ্গীতে হেলিয়া দুলিয়া উঠিল, দেহ হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলাবৃত চুলের রাশি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপের মধ্যে তাহার রাঙা মুখখানি গোপালকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

এদিকে গোপালের নীরবতায় বিধবা উদ্‌গ্রীব হইয়া গোপালের দিকে চাহিল, চিত্ত আবার বলিল—'আমায় নিশ্চিন্ত কর বাবা। তুমি বুঝি দেখনি হতভাগীর রূপ, কই গেল কোথা মুখপুড়ী, ললিতে।' ললিতা ও-ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া গোপালকে ইসারায় কি বলিল, গোপাল সে দিকে চাহিয়া শাশুড়ীর কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল।

শাশুড়ী আবার বলিল, 'তুমি কি আবার বিয়ে—'

সে কথা চিত্ত শেষ করিতে পারিল না। গোপাল এবার বলিল—'না।'

চিত্ত অতি আনন্দে বলিল—'জানি বাবা, ললিতেকে তুমি ভুলতে পারবে না, পোড়ারমুখীই কি তোমাকে ভুলেছে একদিন? এখন ত বড় হয়েছে, তোমার কথা বলতে লজ্জা করে। প্রথম প্রথম বসে বসে কাঁদত, জিজ্ঞাসা করতাম—কিরে, গোপালের জন্যে তোর মন কেমন করচে? ও বলত—হুঁ! তাও এ বাড়ীর চাকরের ছেলে, সে ওর সমবয়েসী, আমার ধর্মবেটা হয়। তাকে পেয়ে তবু মন তার মানে।'

গোপালের মুখ আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বলিল—'তবে উঠি এখন, মুখ হাত ধুই।'

চিত্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল—'মরণ হোক আমার, রোগে পড়ে আমার ভীমরথি ধরেচে। এখনও বাবার আমার হাত মুখ ধোয়া হয় নি, জল খাওয়া হয়নি। আর সেই হতভাগা মেয়ে, কাল-কণ্টক আমার, কোন আক্কেল যদি থাকে এত বড় ধাড়ী মেয়ের। ললিতে, ললিতে!'

ললিতাকে আর দেখা গেল না।

গোপাল বলিল—'থাক্, বাইরেই যাই, মুখ হাত ধুয়ে আসি।' বলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে শোনা গেল, মেয়ে ঝঙ্কার দিতেছে—'বলি, কাল-কণ্টক করবে কি? ঘরে কিছু ছিল না, ভোলাদাদা বাজার থেকে আনলে তবে ত।'

মা বলে—'আগে থেকে আনিয়ে রাখতে নাই?'

—'তুমি ত এখনও মর নাই, আনিয়ে রাখলেও পারতে।'

তারপর সব কিছুক্ষণ নীরব। মেয়ে আবার বলিল—'জানিস মা, তোর-জামাইএর যা রাগ—ফিরে যাচ্ছিল।'

মা ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল—'কেন রে?'

—'আমি ভোলা দাদাকে বল্লাম, ফল আনতে, তা টাকা না নিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল; আমি পেছনে ছুটে গিয়ে ফটকের ধারে টাকা দিলাম, তা দেখি চিতে বাঘের মত ফোঁটা কেটে, ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে। আমি চিনতে পারি নি, বল্লাম, কেরে মুখপোড়া, মুখের ছিরি দেখ'—বলিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। মা গম্ভীর স্বরে বলিল—'ভোলার সঙ্গে হাসি তামাসা হচ্ছিল বুঝি।'

মেয়ের এবার কোন উত্তর শোনা গেল না।

মা আবার বলিল—'কতবার বলবো তোকে, পনের বছরের বুড়ো মেয়ে, ঘর করলে ছুটো ছেলে হতো, আক্কেল তোর কবে হবে? গোপাল দেখেছে তো? তাই সে ভাল করে কথার জবাব দিলে না। মর্—মর্, এখনই মর্।'

দৃষ্টি আছে, তাই জগতে রূপের সৃষ্টি সার্থক। গোপালের দৃষ্টি ছিল, ললিতার রূপ ব্যর্থ হইল না—সৌন্দর্যের মোহ সন্দেহকে স্থান দিল না। চিত্তর মৃত্যুর অন্তে ললিতাকে ঘরে আনিয়া সে সংসার পাতিল।

সে সংসার পাতা যেমন তেমন নয়, লক্ষ্মীর সিংহাসন উজাড় করিয়া গোপাল ললিতাকে বসাইল; সুরের উপচারে, সুন্দরের উপাসক তরুণ কীর্তনীয়া সুন্দরীর উপাসনায় তাহার সুখের বিধানে —সঞ্চয়ের থলি উজাড় করিয়া দিল।

চঞ্চলা মুখরা ললিতা বাড়ীতে পা দিয়াই বলিল—'মা গো—একি উঠোন মেঝে, এযে সব মাটী। তাইতেই তোমাদের কাপড় এত ময়লা হয়। না বাপু রোজ সকালে উঠে যে ঘর নিকানো—'

গোপাল ব্যস্ত হইয়া বলিল—'মেঝে উঠোন অনেক দিন থেকেই বাঁধাবো বাঁধাবো মনে করছিলাম তা এই বার—'

—'হ্যাঁ তাই বাঁধাও, নইলে রোজ সকালে উঠে যে সেই গোবর জলে মাটিতে মাখা—মা গো আমার গা ঘিন ঘিন করছে—ও হরি, এযে চারিদিকে গাছের বেড়া। পাঁচিল কই ?'

ললিতার মার পত্র আসিতেই গ্রামের পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিয়াছিল, গোপালের তাহাতে কিছু আসে যায় নাই! কিন্তু ললিতাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিবার সময় সে বুঝিয়াছিল, পাঁচ জনে এইবার দশ কথা কহিবে, আর সে বানগুলা বিঁধিবে গিয়া ললিতাকেই। তাই ললিতাকে বাঁচাইতে সে গ্রাম ছাড়িয়া বৈরাগীর ঘরে আসিয়া সংসারী হইতে চাহিয়াছিল! বাবাজীর অন্দরের প্রয়োজন ছিল না তাই বাহিরের সহিত অন্তর করিয়া চারিদিকে প্রাচীরের ঘেরা উঠে নাই!

গোপাল ললিতার কথার জবাব দিল—'এটা তো বাড়ী নয়, এটা আখড়া।'

ললিতা একটু বাঁকা ভাবে কহে—'কেনে, তুমি কি বৈরাগী না কি যে লক্ষ্মী ছাড়ার মত—'

গোপাল এবার হাসিয়া জবাব দিল—'লক্ষ্মীছাড়া ঠিক নয়,—তবে লক্ষ্মীহারা হয়ে বাবাজীর ঘরে এসে সংসার পেতেছিলাম। আখড়ায় আজ যখন লক্ষ্মী ফিরে এসেছে, তখন আবার সব হবে।'

হইলও তাই। গাছ কাটিয়া চারিদিকে উঁচু পাকা প্রাচীর উঠিল, আঙিনা হইতে ঘরের মেঝে পর্যন্ত পাকা হইল শুধু নয়, সিমেণ্ট দিয়ে মাজা হইল, রাঙা মাটী দিয়া পরিপাটী করিয়া নিকানো দেওয়ালগুলি কলি চূণে শুভ্র হইয়া উঠিল, বৈরাগীর ছায়া-নিবিড় গেরুয়া রংএর শান্ত কুঞ্জটী হইয়া উঠে অমল ধবল শ্রীমন্দির।

ললিতার ঝঙ্কার মোটেই ললিত নয়, নীরস ঝঙ্কারে সে প্রথম রাত্রিতেই বলিল—'মা গো, এ কি বিছানা গো, এ যে কাপড়ের কাঁথা, এতে কি মানুষ শুতে পারে? ছি ছি ছি, এ যে

চিমটি কাটলে ময়লা উঠে আসছে। এতে শুতে পারবো না বাপু আমি, তুমি শোও, আমি আঁচল পেতে শোব।'

গোপাল তাড়াতাড়ি বকের পাখার মত ধোয়া, তাহার কীর্তনের আসরের ব্যবহার করা একখানা কাপড় বিছাইয়া দিয়া বলিল—'আজ এতে শোও, কাল বাজারে গিয়ে কিনে আনবো সব।'

ললিতা অসন্তুষ্ট চিত্তেই আসিয়া বিছানায় বসিয়া বালিশে হাত দিয়া সেটাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—'এ যে শক্ত ইঁট, এতে মাথা দিলে মাথা ধরবে যে—'

গোপাল আপন হাতখানা প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিল—'আমার হাতে মাথা রেখে শোও—'

ললিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল—'যাঃ, দিলে ত খোঁপাটা নষ্ট করে।'

উঠিয়া বসিয়া সে খোঁপা ঠিক করিতে লাগিল।

গোপাল তাহার মুখপানে চাহিয়া পাগল হইয়া যায়; সে ধীরে ধীরে মুখ বাড়ায়, ললিতা হাসিয়া তাহার মুখটা ঠেলিয়া দিয়া কহে—'দূর, ক্যাঙলার মত, যাঃ।'

গোপাল আরও মাতাল হইয়া উঠে, অতি সন্তর্পণে ললিতাকে বুকের কাছে টানিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গস্পর্শ হইতেই ললিতা বলিল—'ছাড় ছাড়, কি ঘামের গন্ধ তোমার গায়ে!' গোপাল ছাড়িয়া দেয়। অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া উঠে, ললিতা তাহাতে একটুকুও বিচলিত হয় না। সে সমান সুরে বলিয়া চলে—'যাই বল বাপু, রেগো না, বড় নোংরা তুমি, এত ঘাম, তার উপর তেল মেখে গা চটচটে করা কেন, সাবান দিয়ে একটু পাউডার বুলোলেই হয়।'

গোপালের চোখে জল আসে।

ললিতা বলিয়াই যায়—'যেমন চুলকাটার ছিরি, কদম ফুলের মত মাথা, তার উপর হাত দেড়েক টিকি; আবার কপালে বুকে মাটির

ছাপ, যেন চিতে বাঘ; না বাপু বলবো না, একবার যে রাগ!' বলিয়া সে হাসে। গোপাল ভিন্ন শয্যা করে।

ললিতা বলিল—'রাগ হ'ল বুঝি? তা হ'ল ত হ'ল, আচ্ছা আমিও আর ডাকবো না তোমাকে, বুঝে থেকো; দেখব!'

পরদিনই সহর হইতে বিছানা আসিল, সুন্দর পুষ্পলতার চারু-ছবিতে রঙীন ছিটের বিছানা, বালিশ, চাদর, ললিতার জন্য রঙীন কাপড়, সাবান, তেল, আরও কত কি!

ললিতা পরমানন্দে কহে—'বেশ হয়েছে, এই নইলে বিছানা, কিন্তু ছিট পছন্দ ভাল হয়নি; এই যে চুলও কেটেছ দেখছি, কই টিকি দেখি, কত বড় রেখেছ? নাঃ, আরও খানিকটা ছাঁটলে হ'ত।—দেব যাতি দিয়ে কেটে।'

গোপাল দুই হাতে টিকি ঢাকিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল—'না, না, থাক, থাক, কেত্তন করতে হয়, বোষ্টম মানুষ।'

ললিতা খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে জিনিষগুলি ঘরে তুলিল; কিছুক্ষণ পরেই সে আবার ঝঙ্কার দিল—তেলের শিশিটা তুলিয়া কহিল, 'ওকি তেল এনেছ? এ যে বাজারের ওঁছা তেল, বাইরের ছবিখানি দেখে ভুলে এসেছ বুঝি? মাগো, কি পাড়াগেঁয়ে ভূত তুমি—ছি ছি ছি।'

গোপাল ভাবে এ বুঝি বিরূপ মনের স্বরূপ—তাহার মুখ কাল হইয়া উঠে। পরের দিন সে আবার তেল কিনিয়া আনে। ললিতা হাসে, আপন মনেই হাসে, তাহার চটুল রূপে চঞ্চল গতিতে ঘরখানি হাসাইয়া রাখে। দেখিয়া গোপালের বুকটা বেদনায় ভরিয়া উঠে—ললিতাকে যে ও পায় না।

আজও তাহাদের শয্যা পৃথক, ললিতা আজও ডাকে নাই; গোপালও নত হয় নাই। মাঝে মাঝে দুজনে একটু কাছাইয়া

আসে। যখন ললিতা বলে—'গান কত্ত আর শুনবো, একটা ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প বল না।' সে গল্প বলে!

বাহির হইতে কেষ্টদাস হাঁকে—'গোপাল, গোপাল হে, গোপাল হে।' গোপাল বলে, 'শুনে আসি—'

ললিতা বলে—'না যেতে পাবে না, গল্পটি শেষ কর।'

গোপাল যথাসাধ্য কাতরভাব করিয়া উত্তর দেয়—'শরীরটা আজ ভাল নেই দাদা।' ততক্ষণে ললিতা তাগিদ দেয়—'তারপর?'

গোপাল কাহিনী শেষ করিয়া বলিল, 'মজুরী দাও আমার।'

ললিতা মুখখানি আগাইয়া দেয়, তাহার মদিরস্পর্শে গোপাল পাগল হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে সাহস হয় না।

এতক্ষণে গোপাল যায় কেষ্টদাসের সহিত দেখা করিতে, তাহার বাড়ী; গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে ঢোকে—'সুধা ছানিয়া কিবা অধর রচিল গো—চাঁদ নিঙাড়ি মুখ চাঁদ।'

গোপাল কোন রকমে কথা সারিয়া বাড়ী ফেরে। আহারের আসনে বসিয়া গোপাল,—ললিতা যখন নত হইয়া আহারের থালা নামাইয়া দেয়, তখন গোপনে আপনার মুখখানি ললিতার মুখের কাছে আগাইয়া লইয়া যায়,—কিন্তু চকিতে চপলা ললিতা তাহার তরকারী মাখা হাতটা গোপালের মুখে লেপিয়া দিয়া কহে—'চোর।'

কিন্তু সে কয়টা দিন মাত্র। যেখানে দাতা বদ্ধহস্ত—সেখানে দস্যুতায় বরং মেলে কিন্তু ভিক্ষা নিষ্ফল, প্রত্যাখ্যানের বেদনাই সেখানে সার হয়। কিন্তু দস্যুতা গোপালের সাধ্যাতীত। দেখিতে দেখিতে সুখের ঘরে দুঃখ আসিয়া বাসা বাঁধিল; অসন্তোষে দুইজনেই পরস্পরের কাছ হইতে সরিয়া গেল। আরও এক স্থানে দুজনের গভীর গরমিল ছিল। গোপাল ছিল দেব দ্বিজে

ভক্তিমান, আর ললিতা ছিল বিলাসিনী, সে বলিত—'চোখ বুজে ঢং দেখ। বলি এত যে কর—কিছু পেলে?'

—'একদিনেই কি পাওয়া যায়? তবে শান্তি কিছু আসে, তুমি করে দেখ না।'

—'হ্যাঁ; বাবুদের সঙ্গে কাশী গিয়ে বিশ্বনাথই দেখিনি, তা আবার চোখ মুদে পূজা করবো। আমাদের খোকাবাবু কি বলতো জান—ঈশ্বর ফিশ্বর ওসব মিছে কথা। কত সব বুঝিয়ে বলতো—সেত মনে নেই, তবে মনে বেশ বুঝে নিয়েছি।'

গোপাল বিরক্ত হইয়া বলিল,—'থাক্। তুমি যা বুঝেছ তোমার থাক্, আমি যা বুঝেছি আমার থাক।'

ললিতা হাসিয়া বলিল –'সে আমারও পক্ষে ভাল। তোমার চোখে জল ফেলা অভ্যেস না থাক্‌লে কেত্তন জম্‌বে না, দক্ষিণেও বাড়বে না, লোকে প্যালাও দেবে না।'

গোপাল উঠিয়া গেল।

ললিতা বলিল—'রাগ হল বুঝি? তা সত্যি বলবো—রাগ তো রাগ, আমার কিছু বয়ে যাবে না।'

কোন দিন গোপাল আসিয়া কাছে বসে, ললিতা বলে, 'কি মনে করে?' গোপাল কথা কয় না। স্ত্রীর কথার সুরে মনের বিষ ফেনাইয়া উঠে।

ললিতা বলিল—'দিনরাত ভালও তো লাগে তোমার, মেয়ে-মানুষদের কাছে ঘুর ঘুর করতে?'

গোপাল তিরস্কার করে—'ভাল লাগে না দিনরাত তোমার ও ধর ধর ভাব।' ললিতা চুপ করে।

সেদিন আপন অঙ্গের পানে তাকাইয়া ললিতা কহে—'মাগো নিজেরই ঘেন্না করছে, রং হয়েছে দেখ দেখি, যেন পোড়া

গোপাল পরদিনই খুব দামী সাবান কিনিয়া আনিল ; ললিতা বলিল—'আবার সাবান কেন, সাবান দিয়ে কি হবে ?'

—'এতে রং ফরসা হয়। তোমার রং ময়লা হয়েচে সত্যি—তাই।' ললিতা পিচ কাটিয়া বলিল—'তোমার দেশের পোড়া মাটিকে মাখাও গিয়ে। এদেশে চুণ মেখে থাকলেও তুদিন পরে পোড়া কাঠ হবে।'

গোপাল দূরে সাবানটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ললিতা সেটা ফেলিয়া দিল নর্দমায়।

এমনি করিয়া তুটি নর নারীর বিপরীত গতিতে জীবন-মন্থনে বিষ ফেনাইয়া উঠে ; সে বিষ চরমে উঠিল, যেদিন গোপাল দেখিল তাহার উপাসনা ঘরের ঠাকুরের আসন, ছোট চৌকিখানির উপর প্রসাধনের সামগ্রী রাখিয়া ললিতা প্রসাধনে বসিয়াছে। গোপাল কঠোর দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিল।

ললিতা বলিল—'লাল চোখ দেখাচ্ছ যে, মারবে নাকি ?'

—'তোমার কি সত্য সত্যই ভগবানকে ভয় নাই ?'

চুলের গোড়ায় দড়ি দিতে দিতে ললিতা বলিল—'না—'

গোপালের মুখে আর কথা ফুটিল না, একটা তুর্জয় ক্ষোভের মধ্যে বুকটা গর্জন করিয়া উঠিল। ললিতা একদিকের দড়িটা চিবুকে ও বুকের চাপে ধরিয়া আবার বলিল—'ভোলা দাদা ঠিক বলে, ওসব ভণ্ডামি, খাবে দাবে খেলবে, দিন কেটে যাবে, তা আবার ভগবানকে কি দরকার ?'

ওই ভোলা দাদার নামেই গোপালের রুদ্ধ আক্রোশ ফাটিয়া পড়ে, সে বিষ উদ্গার করিয়া কহে—'ঠিক ত, ভগবান মানলে দাদা বলে আবার তার সঙ্গে ভালবাসা কি করে হয় ?'

ললিতার চিবুকের চাপে চাপিয়া রাখা দড়ি খসিয়া পড়িল,

সবে আরম্ভ করা বেণীর ছাঁদ খুলিয়া গেল, সে মুখ তুলিয়া বলিল —'কি বল্লে?'

—'যা সত্যি তাই বলেছি।'

—'তাই যদি তোমার মনে হয়েছিল, তবে আমায় নিয়েছিলে কেন?'

—'নিয়েছিলাম তোমার মায়ের সাধাসাধিতে, আর তোমার ওই বিবিয়ানার চটকে ভুলেছিলাম।'

—'খবরদার বলছি, আমাকে যা বলছ বল, আমার মাকে কিছু বলো না। অতি ছোটলোক তুমি।'—বলিয়া সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অশ্রুমুখী ললিতা আবার দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল —'আমাকে পাঠিয়ে দাও তুমি।'

গোপাল ব্যঙ্গভরে বলিল—'কোথায়, কোন চুলোয়?'

—'কেন লোক নাই নাকি আমার?'

—'সেই ভোলা দাদা ত? ধর্মভাই?'

ললিতা আবার কাঁদিয়া ঘরে ঢুকিল।

গোপাল ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল, অশান্ত মন লইয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, শান্ত স্বভাব লোকটির ধীরে ধীরে রাগ পড়িয়া আসিল, সে আপন মনে ছি ছি করিয়া মরিল, মনের গ্লানির সীমা রহিল না। মনে পড়িতে লাগিল ললিতার বিষণ্ন মুখ, অশ্রু ভরা দুটি চোখ, বিলাসিনীর বিলাসে উপেক্ষা।

লজ্জায় সে আর বাড়ী ফিরিতে পারিল না, সে ওই পথে পথে আপনার গ্রামে চলিয়া গেল, পথে একটা লোককে বলিয়া গেল— 'আমাদের বাড়ী বলে দিয়ো ত, আমি তারাচী যাচ্ছি, দিন চার পরে

ফিরবো। স্থানান্তরে গিয়াও সে শান্তি পাইল না, কত উদ্ভট চিন্তা আসিয়া জুটিল—ললিতা যদি গলায় দড়ি দেয়, যদি জলে ডুবিয়া মরে!

কোন রকমে রাতটা কাটাইয়াই গোপাল বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, ললিতা জলে ডোবে নাই, গলায় দড়িও দেয় নাই, তবে চলিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে মোটা মোটা করিয়া লেখা—'চল্লাম, ভোলার কাছেই যাব।' গোপাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিল অর্থহীন ভাবনা। আজ মনে মনে সে দোষ খতাইয়া দেখিল, আজ সব দোষ নিজের দিকেই চাপিল।

সে কলিকাতায় যাইবে স্থির করিল। বাক্স খুলিয়া দেখিল, ললিতা শুধু যায় নাই—তাহার নিজের অলঙ্কার, গোপালের সঞ্চয় সবই নিঃশেষ করিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

তবুও সে কলিকাতায় গেল, দেখিল ভোলা বিবাহ করিয়া সংসারী, বাবুদের বাড়ীতেই থাকে, ললিতা সেখানে নাই। লোকে বলিল—তবে সে বাজারে দোকান খুলে বসেছে খাঁটি। গোপাল ফিরিয়া তাহার বড় সাধের পাতানো ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল—স্বর্ণের জন্য নয়, রৌপ্যের জন্য নয়, রূপের পসরা ললিতার জন্য!

কেষ্টদাস বলিল—ভায়া মন শক্ত কর।

গোপাল ম্লান হাসিয়া বলিল—ও বিধাতার ঘা দাদা, সইতেই হবে, সয়েছি যখন তখন শক্ত হতেই বা বাকী কি?

—হ্যাঁ, মন খারাপ করো না, আর কার জন্যে মন খারাপ করবে, কুলটা নারী।

গোপাল বাধা দিয়া বলে,—থাক দাদা, কু-কথা বলো না, তার দোষ নেই।

—দোষ নেই?

—না ; রাধারাণীর জাত ওরা অভিমানেই সারা, অভিমান বশে কি যে করে বসে ওরা—সে ভগবানও বুঝি বুঝতে পারেন না।

—আচ্ছা, না হয় মানলাম মানময়ীর মানই হয়েছিল, তা গলায় দড়ি দিলে না কেন—

—এ মরার বাড়া দাদা, এ তোমার জ্যান্তে পোড়া।

—যাক্ মরুগ গে ওকথা, এখন আমার কথা শোন। আবার সংসার পাত, ভাল বংশের সুন্দরী দেখে—

—না দাদা আর না, সুন্দরীর উপাসনা আর আমার সহ্য হবে না, আমার সুন্দরই ভাল ; শ্যামই ভাল, আর কটাই বা দিন!

—দিন এখনও অনেক, এইত মোটে উনিশ বিশ বয়েস, তা একটা মেয়ের রূপে ভুলে—।

—রূপ তো তুচ্ছ নয় দাদা, রূপের জন্যেই তোমার মহাদেবের কপালে চাঁদের ফালি।

—ওসব শাস্তর ফাস্তর রাখ বাপু, বলি স্ত্রী মলে কি কেউ বিয়ে করে না ?

গোপালের মুখে সেই হাসি, সে বলে—করে, আবার কেউ করেও না।

কেষ্টদাস বলে—আচ্ছা, আমিও মরবো না, দেখব, আর দুদিন যাক্।

দুদিন গেল, দশ দিন গেল, মাস বৎসর চলিয়া গেল, গোপাল কিন্তু গোপালই রহিয়া গেল, নারীর সহিত আর সে সম্বন্ধ পাতাইল না। সুরের উপচারে সুন্দরের উপাসনায় সে মজিয়া গেল।

ভক্ত বলিয়া দশে পূজা করিল, সুর সাধনায় খ্যাতি রটিল। বিরহের গানে নাকি তাহার অসাধারণ ক্ষমতা, চক্ষু কাহারও

শুষ্ক থাকে না, সে যখন গায় 'শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি, ধরিনু নয়ন ফাঁদে' ; লোকে বলে—ও পেয়েছে নিশ্চয় পেয়েছে।

তিন বৎসর পর নবদ্বীপের নিমন্ত্রনে সকল কীর্তনীয়া আসিয়াছে, গানের নৈবেদ্যে নবদ্বীপচন্দ্রের পূজা দিতে। বৈষ্ণব মণ্ডলী আসর ও বিষয় বিভাগ করিয়া দিবেন।

কয়জন কীর্তনীয়া এবার ধরিল—গোপাল দাসের বিরহটাই শুধু জানা আছে সাধা আছে, বিরহ গেয়ে ফি ফি বছরই ওই মালা পাচ্ছে, এবার ওকে মিলন গাইতে বলা হোক।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় সে কথা বলিতে, গোপাল কহিল—কথা সত্য, বিরহ গানে আমার প্রাণ সাড়া দেয়, আর ওই গানই আমি আলোচনা করেছি বেশী। আর দেবতাকে মানুষ তার প্রিয় দ্রব্যই দিয়ে থাকে, সুতরাং আমাকে অন্য অনুমতি দেবেন না। না হয় মালার বিচারে আমায় বাদ দেবেন।

সে কথায় কেহ কান দিল না, বলিল—না, এবার তোমার মুখে মিলন গান শোনা নবদ্বীপচন্দ্রের অভিপ্রায়। আর কোন কথা বলা চলে না।

কেষ্টদাস কহিল—ভাল করলে না ভায়া।

গোপাল করিল—গোবিন্দ ভরসা দাদা।

গোপাল বাসায় বসিয়া আড্ডাই দেয়, মিলনের গান কেমন ফিকা হইয়া যায়।

গোপাল বলিল—এ যে আসচে না দাদা, তুমি গাও, আমি বরং দোহারি করি। কেষ্ট দাস হাত জোড় করে—বড় ভাই হ'য়ে হাত জোড় করছি ভাই। দলের লোক কহে—গাইব না আমরা।

ওদিকে গৌরাঙ্গ মন্দিরে বিরাট আসর পড়িয়াছে—দলের পর

দল পর্যায়ের পর পর্যায়ে ব্রজলীলা গাহিয়া চলিয়াছে। নিপুণ গায়কের সুরে, প্রাণের আবেগে সে লীলা যেন চোখের উপর ভাসিয়া চলিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে বিরহের গান চলিতেছিল, শতবর্ষব্যাপী বিরহ; নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,—সমস্ত ব্রজে কি যেন একটা কালিমামাখা, শুক-সারী আর ডাকে না, রাধাশ্যাম লইয়া তাহারা আর দ্বন্দ্ব করে না, কাঁদে। কোকিল কোকিলা মূক, ময়ুর ময়ূরী ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা দেখিয়া আর নাচে না, শ্যাম লাবণ্য মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়, ধেনুপাল বেনু-রবের অপেক্ষায় মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, মূক পশুর চক্ষে অজস্র ধারা। তরুলতার আর ফুল ফোটে না, কদম্বতরু পত্রহীন, যমুনার কলকল্লোলে ক্রন্দনের সুর, অভিমানিনী রাধার আজ আর অভিমান নাই। শীর্ণ তনু, প্রাণ আর থাকে না। তবু চিন্তা—'কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবো।' শ্যামকে যে তার মত ভালবাসিতে আর কেহ নাই।

সখিবৃন্দের প্রতি মর্মান্তিক অনুরোধ—প্রিয়তমের জন্য তাঁহার দেহখানি যেন রাখা হয়, আর রাখা হয় যেন কৃষ্ণবরণ তমালের ডালে।

গায়ক গায়,—

'না পুড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে॥'

মানুষের বুক হাহাকার করে, আসরে অশ্রু বন্যা বহিয়া যায়। লোকে বলে—এর উপর গাইতে গোপাল দাসকে আর হয় না।

—হ্যাঁ, এবার মালা গোপাল দাসের ভাগ্যে নাই।

কেহ কেহ বলে, বিরহ গানই এমনি, যে গাইবে, সেই শ্রেষ্ঠ হবে, মাঝখান থেকে গোপাল দাসের নাম হ'য়ে গিয়েছে।

গোপাল বাসায় বসিয়া মনে মনে গোবিন্দের শরণ ভিক্ষা করিল, কিন্তু চিত্ত কিছুতেই স্থির হইল না, মনে বল পাইল না।

দীর্ঘ বিরহের পর বিরহী দুটী প্রাণীর মিলন সে যে কল্পনাও করিতে পারে না। বিগ্রহ মূর্তি মনে আনিল। পাষাণ মূক বিগ্রহ অচল অবিচলই থাকিয়া যায়। সে মূর্তি সজীব করিতে গেলে সম্মুখে দাঁড়ায় চঞ্চলা অভিমানদৃপ্তা রোদন-রক্ত আঁখি, স্ফুরিত-অধরা ললিতা।

বিভ্রান্তচিত্তে, সন্ধ্যার মুখে সে গঙ্গাতীর দিয়া চলিল; কেষ্টদাস কহিল—খবর দিয়েছে সন্ধ্যের পরই এদের আসর ভাঙবে। তুমি যাবে কোথা?

—আসি দাদা গঙ্গার ধার থেকে, ততক্ষণে তোমরা গিয়ে আসর পাতবে।

পথে একটা মঠে নারীদের সংকীর্তন হইতেছে, অনাথা পতিতাদের আশ্রম, সংকীর্তনে গাহিতেছিল মূল গায়িকা—

'বড় দুঃখ দিয়েছি হে ধরায়েছি পায়—
ক্ষমা কর পায়ে রাখ দুখিনী রাধায়।'

গোপাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, এই সুর, এই গান চাই। সে ধীরে ধীরে মঠের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিগ্রহের সম্মুখে কীর্তন হয়, নারীদের হাতে সব একগাছি মালা, আরতির পরে বিগ্রহের চরণে উপহার দিবে। গোপাল দাস বিগ্রহ প্রণাম করিতে গিয়া স্থাণুর মত অচল হইয়া গেল যেন; কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। বিগ্রহকে সে প্রণাম করিল না, দেবমূর্তির পানে পিছন ফিরিয়া সে গিয়া গায়িকার হাত ধরিয়া বলিল—ললিতা!!

আরতির দীপ তখন জ্বলিয়াছে।

গান বন্ধ হইয়া গেল—নির্বাক ললিতা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। গোপাল বলিল—ফিরে এস।

গোপালের কথার উত্তরে ললিতা কি কহিতে গেল, কিন্তু শুধু ঠোঁট দুইটী কাঁপিয়া গেল, কথা ফুটিল না। গোপাল আবার কহিল—আমি যে তোমার জন্যে শূন্য ঘর নিয়ে বসে আছি।

পিছন হইতে একটা সজোর আকর্ষণে দরোয়ানটা গোপালকে টানিয়া লইয়া লাঠি উঠাইল; ললিতা ত্বরিত গতিতে গিয়া গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—আমার স্বামী।

ললিতা নিজ হাতে বিগ্রহের জন্য গাঁথা মালা গোপালের গলায় পরাইয়া দিল, চন্দন দিয়া ললাট চর্চিত করিয়া দিয়া কহিল—আজ সত্যিই সার্থক মালা গেঁথেছিলাম।

গোপাল বলিল—আচ্ছা, আমিও মালা আনছি।

ললিতা গোপালকে সাজাইতে সাজাইতে বলিল—যা লিখে এসেছিলাম তা মনে কত্তেও ঘেন্না হয় নিজের উপর। ভগবান অনাথার আশ্রয়। তিনি নিয়ে গেলেন হাত ধরে মাসীর বাড়ী। মাসী এল এখানে, এসে ম'ল। আমি মঠে এসে ঠাকুরের পায়েই পড়লাম।

গোপাল বলিল—তবু আমায়—

ললিতা বাধা দিয়া বলিল—বটে, সেধে যাবো আমি, তার চেয়ে মরণ ভাল আমার।

গোপাল ললিতাকে বুকে টানিয়া লইতে গেল কিন্তু বাহির হইতে দলের একজন ডাকিল—মূল গায়েন—

ললিতা লজ্জায় আপনাকে ছাড়াইতে চাহিয়া বলিল—ছাড় ছাড়, এসে পড়বে।

আজ দস্যুর মত লুণ্ঠন করিয়া লইল গোপাল।

কীর্তন গাহিয়া ফিরিয়া গোপাল হাসিমুখে গৌরগলার প্রসাদী মালা ললিতার গলায় পরাইয়া দিল। ললিতা সে মালা মাথায়

তুলিয় গোপালকে প্রণাম করিয়া বলিল—ছি, দেবতার প্রসাদী মালা মাথায় দাও। গোপাল তাহার কথার উত্তর দিল না, সযত্নে তাহাকে তুলিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল—

'বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে—
দেখা না হইত পরাণ গেলে।'

ললিতা তাহার বুকে মাথা রাখিয়া বলিল—তা হলে মরবার সময় আর দেবতার নাম করতাম না।

॥ সুরতহাল রিপোর্ট ॥

দারোগাবু 'সুরতহাল' রিপোর্ট লিখছিলেন।

'মৃতা কড়ি বাউড়িণী, বয়স অনুমান পঁচিশ-ছাব্বিশ, কিছু বেশীও হইতে পারে—কারণ তাহার সন্তানাদি হয় নাই। ঘরের কড়িকাঠে গরু বাঁধিবার দড়ি আটকাইয়া গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলিতেছে দেখা যায়। লাস দেখিয়া গলায় দড়ির ফাঁস আটকাইয়া দম বন্ধ হইয়াই মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ঘাড় ভাঙিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।'

মাস দেড়েক পূর্বে কড়ির স্বামী ভোলা মারা গেছে। মাস দেড়েকের মধ্যে কড়ি গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

লোকে আশ্চর্য হ'ল না। কড়ি ছিল ভোলা-অন্ত প্রাণ। ভোলাকে পুড়িয়ে এসে ঘরের দাওয়ার উপর যেভাবে সে বসেছিল —তাতে বাউড়ীদের দেবেন নোটন নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করেছিল, কড়ি হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

মাস দেড়েক আগের কথাই বলছি।

ভোলার শব সৎকার করে এসে কড়ি ঘরের দাওয়ার উপর এসে বসল। তার সব যেন শূন্য মনে হচ্ছে। ঘর দোর বিশ্ব সংসার—সব খাঁ খাঁ করছে। সে ভাবছিল—সে কি করবে? তার কি হবে?

শুধুই তো সব শূন্য হয়ে যায় নি—দুনিয়ায় লোক তাকে যে দড়ি দিয়ে বাঁধবার জন্যে এগিয়ে আসছে। ভোলা নেই—কে তাকে রক্ষা করবে?

কড়ি শিউরে উঠল।

কড়ি বাউড়ীর মেয়ে। বাউড়ারয়ে সাঙা আছে, মানে মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিয়ের রেওয়াজ আছে; স্বামী বেঁচে থাকতে তাকে ছেড়েই সে অন্য জনকে বিয়ে করতে পারে, স্বামী মরে গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু কড়ি আর কাউকে বিয়ের কথা ভাবতেই পারে না এবং কোন লোকও কড়িকে বিয়ে করার কথা মনে করতে পারে না। তার কারণ একদিকে কড়ি সতী, অন্যদিকে সে চোর, পাকা নামজাদা চোর। কড়ির অনেক ভাগ্য যে, তার স্বামী ভোলা নিজে ছিল চৌকীদার—তাই বার বার চুরি করেও সে জেলে যায় নি। নইলে, লোকে বলে, জেল ছিল অনিবার্য।

সুযোগ-সুবিধে পেলে, লোকজন না থাকলে বা অন্ধকার রাত্রেই চোরে চুরি করে, কিন্তু কড়ির চুরি দিনে দুপুরে—হাজারো লোকের মধ্যে, একেবারে হাটে পর্যন্ত। লঙ্কা, নেবু, কুল, ছোটখাটো তরী-তরকারী চুরি চুরিই নয়—ওসব তো ভদ্রলোকেও করে; লঙ্কা, কি নেবু, কি কুল—মুঠো দরুণে তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে, নাকে শুঁকে, অর্দ্ধেকগুলো ফেলে দিয়ে, অর্দ্ধেকগুলো আত্মসাৎ করার পদ্ধতিটা প্রায় প্রচলিতই হয়ে গেছে; দশজনের কাছে জিনিষ দেখে ফিরলেই পাঁচ মুঠো হয়ে যায়। থানার লোকে পর্যন্ত ও চুরি ধরে না—ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেয়। হাটের ফড়েরা বড় জোর এমন লোকের হাত চেপে ধরে মুচড়ে জিনিষ কেড়ে নেয়, তার বেশী কিছু বলে না। কড়ির চুরি লঙ্কা, নেবু চুরি নয়—সে চুরি করে কপি, মাছ, কমলা, ল্যাংড়া, মালদহের আম, কাঁঠাল এলে সবচেয়ে ভাল কাঁঠালটি—মোট কথা হাটের সেরা জিনিষটির ওপর তার নজর থাকে। তেমন জিনিষ না থাকলে কড়ির নজর পড়ে কাপড় কি গামছার দিকে। তা না পেলে সে মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে হাটুরেদের পয়সার থলেটার দিকে হাত বাড়ায়। ধরাও মধ্যে মধ্যে পড়ে, হাটুরে

থেকে খদ্দেররা পর্যন্ত প্রহার দেয়, দুপ দাপ শব্দে কিল-চড় পিঠে পড়ে, ধাক্কা খেয়ে পড়েও যায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে ওঠে, বলে —তা মার কেনে, তা মার কেনে—অন্যায় হয়ে যেয়েছে—তা মার কেনে।

এ সব অবশ্য আগের কথা ; ইদানীং ভোলার কল্যাণে সে এসব থেকে অনেকখানি রেহাই পেয়েছিল। ভোলার মত ভালো লোক বড় দেখা যায় না, তার ওপর সে ছিল চৌকীদার —লোকে ভোলার পরিবার বলে তাকে ছেড়ে দিত। কড়ির ঠিক বিপরীত চরিত্র ছিল ভোলার। একবার সে পথের উপর একতাড়া নোট কুড়িয়ে পেয়েছিল—দশ টাকার পনেরখানা নোট ; ভোলা সে নোটের তাড়াটি একেবারে সরাসরি হাজির করে দিয়েছিল থানায় দারোগাবাবুর কাছে !

দু ক্রোশ দূরের একখানা গ্রামের এক চাষীর টাকা ; লোকটি জমি বিক্রী-করা সাড়ে পাঁচশো টাকার পাঁচ তাড়া নোটের মধ্যে দেড়শো টাকার তাড়াটাই অতি সাবধানতার আতিশয্যের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিল। টাঁকার তাড়াটি ফেরত পেয়ে তার দু চোখ বেয়ে জল এসেছিল—সে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করে একখানা দশ টাকার নোট ভোলাকে দিতে চেয়েছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে ভোলা সে টাকা নেয় নি। দুই হাত জোড় করে বলেছিল—মাজ্যনা করন্নেন মণ্ডল মশায়।

লোকটি ভোলার দিকে চেয়ে মিনতি করে বলেছিল—আরও বেশী দিতে হয় আমি জানি, কিন্তু—

বাধা দিয়ে ভোলা বলেছিল—আজ্ঞে মা। তার জন্যে লয় মণ্ডল মশায়।

—তবে ?

—মানুষ কম দুঃখে জমি বিক্রী করে না মণ্ডল মশায়।

আপনার অনেক দুঃখের টাকা, লক্ষ্মী বেচা টাকা—উ আমি লিতে পারব না।

দারোগাবাবু ছিল ঘাগী লোক, এল-সি থেকে এ-এস-আই, তার থেকে এস-আই বা দারোগা, বড় বড় পাকা গোঁফ—মাথার চুলও আধকাঁচা, আধপাকা ; কোন রকম ভণ্ডামি তার নিজেরও ছিল না—পরেরও সহ্য করতে পারত না। সে পর্যন্ত এক্ষেত্রে ভোলার পিঠে প্রকাণ্ড একটা চাপড় মেরে বলেছিল—সাবাস বেটা!

কথাটা সে পুলিশ সাহেবের কানেও তুলেছিল। সাহেব নিজের পকেট থেকে ভোলাকে বকশিশ দিয়েছিল দু টাকা।

শুধু এইটুকুই ভোলার খাতিরের কারণ নয়। ভোলা একবার একা একদল ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে একজন ডাকাতকে ঘায়েল করে তাকে ধরেছিল। সে একটা কাহিনী। ডাকাতের দলের ডাকাতী করা ভোলা একা রুখতে পারেনি, কিন্তু প্রথম থেকেই সে দূরে দূরে থেকে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছিল। ডাকাতের দল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সরে পড়েছিল। ভোলাও তাদের পিছু নিয়ে চীৎকার করতে করতে চলেছিল। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ, সেই মাঠের মধ্যেও ভোলা তাদের পিছন ছাড়েনি—বাঘের পিছনে ফেউয়ের মত সে ডাকতে ডাকতে চলেছিল। মাঠের শেষে নদী, নদীর ধারে জঙ্গল। জঙ্গলের ধারে এসে ডাকাতদের সবচেয়ে সেরা লাঠিয়াল ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। সে লোকটা মেয়ে কি ছেলের হাত থেকে গয়না টেনে খুলতে গিয়ে আঁটো বোধ হলে—ধারালো হেঁসো দিয়ে হাতটাই কেটে নিত, কাণের গয়না সে জীবনে কখনও খুলে নেয় নি, টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে চিরকাল। এ লোক সেই লোক। ফেউয়ের ডাকে তিক্ত-বিরক্ত বাঘের মতই সে আক্রোশ ভরেই ঘুরেছিল

ভোলার মুণ্ডটা ছিঁড়ে কি ছেঁচে দেবার জন্যে। কিন্তু তার কপাল, আর ভোলার কপাল। অন্ততঃ লোকে তাই বলে—ভোলার কপালের দোহাই দেয়। নইলে সে লোকের সামনে ভোলার দাঁড়াবার যোগ্যতা ছিল না। ভোলার কপালের গুণেই অন্ধকারের মধ্যে লোকটা একটা ইন্দুরের গর্তের মধ্যে পা আটকে পড়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ভোলা বসিয়েছিল মোক্ষম লাঠি। তারপর তার বুকের উপর বসে মাথার পাগড়ী খুলে তাকে বেঁধেছিল। ডাকাতের দল তাদের লাঠিয়ালের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল তাই তারাও গিয়ে পড়েছিল অনেকটা দূরে। ভোলা তখন ডাকাতটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল গ্রামে। এর জন্যে সে সরকার থেকে বকশিশ পেয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী পেয়েছিল গ্রামের লোকের স্নেহ, সাদর পৃষ্ঠপোষকতা।

ঠিক এই জন্যেই কড়িকে লোকে হাতে-নাতে ধরেও খুব বেশী নির্যাতন করত না। হাটে ধরা পড়লে এই জন্যেই অনেক সময় থানার লোকেও তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথম প্রথম ভোলা নিজেও তাকে প্রহার করত; ইদানীং সে-ও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শুধু বলত—ছি-ছি-ছি!

কড়ি খটখটে চোখের দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকত।

ভোলা আবার বলত—'যাকে দশে বলে ছি, তার জীবনে কাজ কি?' তু মর-মর-মর, তু-মর। মরণ যদি না হয় তো গলায় দড়ি দিয়ে মর। জলে ডুবে মর। বিষ খেয়ে মর।

কড়ি তবুও চুপ করেই থাকত। তার দৃষ্টি অদ্ভুত দৃষ্টি, পলক পড়ে না, সাপের মত চেয়ে থাকত। দৃষ্টি দেখে কোনদিনই কড়ির মনের দুঃখ, কি লজ্জা, কি আনন্দ কিছুই বুঝতে পারা যায়নি।

ভোলা আবার বলত ওই মরবার কথা—মর—মর—মর, তুই মর।

আবার কড়ি মৃদুস্বরে বলত—হ্যাঁ। মরব তাই। হ্যাঁ।

—মরবি না তো আমাকে এমনি করে জ্বালাবি তু?

—কেনে? কি করলাম কি? কি জ্বালালাম তোমাকে?

ভোলা হতবাক্ হয়ে যেত বিস্ময়ে।

কড়ি বলত—চুরি করেছিলাম, তার লেগে তো লোকে আমাকে মেরেছে।

তারপর অকস্মাৎ ভোলার পায়ে ধরে কাঁদত—তুমিও না হয় মার। যে হাতে আমি চুরি করি, সেই হাতখানা আমার ভেঙে দাও। আমার মরণই যদি দাও, তবে তুমিই আমার টুঁটিতে পা দিয়ে মেরে ফেল।

ভোলা তবু তাকে ভালবাসত।

কতজন—মায় থানার লোকে পর্যন্ত তাকে কতবার বলেছে, ও মেয়েটাকে তুই ছেড়ে দে ভোলা। তোর মত লোকের অমন চোর পরিবার, ছি-ছি-ছি!

ভোলা মাথা চুলকে বলত—আজ্ঞে? যেন কথাটার অর্থ তার মাথায় ঢোকেই নি।

—ছেড়ে দে হারামজাদী চোরকে।

ভোলা তবুও সেইভাবে মাথাই চুলকে যেত। কোন উত্তরই দিত না।

ভোলা যে জানে কড়ির আর এক পরিচয়।

বাউড়ীর মেয়ে হলেও কড়ি সুন্দরী মেয়ে। ভদ্রলোকেদের মেয়েদের মত ফরসা রঙ, তেমনি শ্রী। কড়িকে কতবার কতজন প্রলুব্ধ করেছে; ভোলা নিজে চোখে দেখেছে—বাবুদের ছেলে কড়িকে টাকা দেখাচ্ছে, কিন্তু কড়ি একবার মাত্র তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে চলে এসেছে, ফিরেও তাকায় নি আর। ভোলা তখন

বাবুদের বাড়ী কাজ করত ; সে নিজের চোখে দেখেছিল, তারই মনিবের ছেলে কড়িকে টাকা দেখালে, কিন্তু কড়ি দেখবামাত্র চোখ ফিরিয়ে নিলে, চলে গেল। বাড়ীতে ফিরে ভোলা কড়িকে কাঁদতে দেখেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করতে কড়ি বলেছিল অকপট সত্য কথা।

তাদের স্বজাতির মধ্যে অনেকে প্রথম প্রথম কড়ির মন ভাঙ্গাতে চেষ্টা করেছিল। কড়ি তাদের গাল দিত তারস্বরে। ভোলা আসবামাত্র বলে দিত তাদের কথা।

দুটো ব্যাপার যেন পাশাপাশি চলত।

সকালে কড়ি চুরি করত। ভোলা তিরস্কার করত,—কড়ি পায়ে ধরে কাঁদত। সন্ধ্যেয় কড়ি চীৎকার করত অথবা অঝোর ঝরে কাঁদত।

—কি হ'ল ? চেঁচাচ্ছিস কেনে ?

—ওই দেব্না। বাঁশবুকো'—তিদ্দশে নামুনেতে খাবে, নামুনেতে খাবে।

—থাম বাপু থাম।

—না কেনে ? থামবে কেনে ? আমাকে—

—আঃ—

—কিসের আঃ। যা-না-তাই বলবে—আর আমি চুপ করব ?

কড়ির গালিগালাজের মাত্রা বেড়েই চলত উত্তরোত্তর।

স্বজাতি বা সমশ্রেণীর ক্ষেত্রে কড়ি গাল দিত ; কিন্তু উঁচু জাতের ভদ্রশ্রেণীর ক্ষেত্রে সে অঝোর ঝরে কাঁদত।

সে হ'লে ভোলাকে সান্ত্বনা দিতে হ'ত। ভোলার সান্ত্বনায় কড়ির কান্না বেড়ে যেত। অনেক কষ্টে অবশেষে সে বলত—ওই আধাকেষ্ট বাবু (রাধাকেষ্ট) আমাকে—আর বলতে পারত না কড়ি, আবার অঝোর ঝরে কাঁদত।

শুধু তাই নয়। কড়ির মত পরিশ্রমী মেয়ে সংসারে দেখা যায় না। দিনরাত সে খাটছেই খাটছে। কখনও ধান মেলে দিচ্ছে, ধান তুলছে, ধান ভানছে, কখনও কাঠকুটো ভেঙে আনছে, গরুর সেবা করছে, ঘুঁটে দিচ্ছে, মাথায় ক'রে সেই ঘুঁটে বেচে আসছে; কাজের তার বিরাম নেই। ভোলার গরু ছিল—ভাগে জমি নিয়ে সে চাষও করত। কড়ি সমানে তার সঙ্গে খাটত। তাদের জাতের সকল মেয়েই খাটে—কিন্তু কড়ির কাজের সঙ্গে কারও কাজের তুলনা হয় না।

ভোলা এমন কড়িকে প্রাণ দিয়ে ভাল না বেসে পারে নি।

সেই ভোলার মত স্বামী মরে গেল। কড়ি ভোলার সংকার করে এসে আপনার দাওয়ায় বসে ভাবছিল—তার কি হবে? সে কি করবে?

আশ্চর্যর কথা। কড়ি জীবনে এমন আশ্চর্য বোধ কখনও করে নি। তার মনে হ'ল ভোলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটার চেহারাই যেন বদলে গেছে। প্রতিটি মানুষ যেন অন্য রকম হয়ে গেছে।

ভোলার পুরনো মুনিব বাড়ীর সেই ছেলেটি দীর্ঘকাল ধরেই কড়িকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে এসেছে। এই সেদিন ভোলার অসুখের সময়েও সে কড়ির দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়েছে—যে কথাগুলি বলেছে তার মধ্যে থেকে কড়ি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছে অন্য রকম অর্থ। কড়ি খুব তাড়াতাড়িই যাচ্ছিল। কাঠ-বমির আক্ষেপে ভোলা কাতর হয়ে পড়েছিল; লেবুর রসে উপকার হবে—লেবুর গন্ধ শুঁকলেও আরাম পাবে, তাই সে যাচ্ছিল কয়েকটা পাতিলেবুর সন্ধানে। হাটবার হলে ভাবনাই ছিল না, কিন্তু হাটবারের দেরী আছে দু'দিন। কড়ি যাচ্ছিল রাম বাবুদের বৈঠকখানার দিকে, বাবুদের বৈঠকখানার সামনে ছোট বাগানটার

মধ্যে দুটো পাতিলেবুর গাছ আছে, ফলও ধরে আছে অনেক। পাঁচীলের একটা জায়গা ভাঙা আছে, সেও কড়ির অজানা নয়। হঠাৎ পথে ওই বাবুদের ছেলের সঙ্গে দেখা। ওর চরিত্র কড়ি ভালই জানে—সে একবার তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়েই হন হন করে চলে যাচ্ছিল। ছেলেটি ডাকলে—ওরে, এই কড়ি!

বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই কড়ি উত্তর দিয়েছিল—কিগো? বলছ কি?

—যা গেল! বলছি ভোলা আছে কেমন?

—ভাল নাই বাপু।

—ডাক্তার দেখাচ্ছিস তো? কোথায় যাচ্ছিস এমন করে?

—আমি মরি নিজের জ্বলনে, তুমি আর জ্বালিও না বাপু।

—জ্বালানো কি হল? এমন হন হন করে যাচ্ছিস, তাই জিজ্ঞাসা করছি। কোন কিছুর দরকার থাকলে বলিস—ভোলা আমাদের পুরানো চাকর, তাছাড়া ভাল লোক।

—না, কিছু দরকার নাই।

—তোর কথাবার্তা এমন কেন বলতো? মানুষের সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে জানিস না?

—না জানি না। বলেই কড়ি হন হন করে চলে গিয়েছিল। 'কিছু দরকার থাকলে বলিস।' কেন? দরকার থাকলেই বা তোমাকে সে বলবে কেন? তোমারই বা এত দরদ কেন? 'তোর কথাবার্তা এমন কেন? মানুষের সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে জানিস না?' না। কড়ি জানে না সে ধরণের কথাবার্তা! ছি! ছি!

ভোলার মৃত্যুর পর সে লোকও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। মাত্র এক মাসের মধ্যে। আশ্চর্য! কালই তার সঙ্গে কড়ির দেখা হ'ল। ভোলার মৃত্যুর পর এই প্রথম দেখা।

কড়ি তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চাইলে।

সে বললে—ভাল আছিস কড়ি?

কড়ির চোখ ভরে আজ জল এল। গলার স্বর ধরে এল—সে কথা বলতে পারলে না।

বাবুদের ছেলেটি বললে, ভোলার মত লোক আর হবে না। বড় ভাল লোক ছিল সে।

কড়ি এবার মুখ তুলে তার দিকে চাইলে। আশ্চর্যের কথা—তার চোখে মুখে কোথাও এমন কিছু নেই যা দেখে কড়ির চোখ নত হয়ে পড়ে, মন ঘেন্নায় রি-রি করে ওঠে।

ছেলেটিই আবার বললে—কি করবি বল? এর ওপর তো মানুষের হাত নেই।

আঁচল দিয়ে আপনার চোখ মুছে কড়ি বললে, কি করে খাব মশায়, তাই ভাবছি। পোড়া পেট তো মানবে না।

—ভগবান আছেন রে। তিনিই যা হয় করবেন।

—আপনকাদের বাড়ীতে একটা চাকরী দেবেন মশায়? ঝিয়ের কাজ?

—কাজ?

—হ্যাঁ। বলেন তো দিনরাতই থাকব আপনাদের বাড়ীতে।

ছেলেটি বার বার ঘাড় নেড়ে বললে—না বাপু। সে পারব না।

একটু থেমে আবার সে বললে—তোমার স্বভাব-চরিত্র ভাল, কিন্তু তুমি বড় চোর।

কড়ি মাথা নীচু করে বললে—চুরি আর আমি করব না।

ছেলেটি হাসলে।

কড়ি বললে—আপনকার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ছেলেটি বললে—থাক্।

কড়ি তার দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি হাসি হেসেই বললে—বিশ্বেস

হচ্ছে না আপনকার ? আপুনি যা বলবেন—তাই করব আমি।

—না বাপু। বরং দরকার হয়তো কিছু ধান-চাল সাহায্য দেব। চাকরী-বাকরী হবে না।

মাথা হেঁট করেই কড়ি ফিরে গেল। সে ঠিক চাকরীর সন্ধানে বার হয়নি। বেরিয়েছিল অমনিই। ভোলার মৃত্যুর পর থেকে এই একটা মাস সে ঘরের মধ্যেই ছিল। ভোলা যা রেখে গেছে—তা তাদের জাতির পক্ষে অনেক! ভোলা চাষ করত—চাষের ধান সঞ্চয় করে ছোটখাটো একটি মরাই সে বেঁধে রেখে গেছে; চৌকীদারীর মাইনে, বকশিশ থেকে পনের গণ্ডা টাকাও তার জমানো আছে। ঘরে পেতল, কাঁসাও কয়েকখানা করেছিল ভোলা। দুটো হেলে বলদ আছে, সে দুটো বেচলেও আট-দশ গণ্ডা টাকা হবে। একটা গাই আছে, সের দেড়েক দুধ দেয়। দুধ বেচলেও রোজ আট-দশ পয়সা হবে। পেটের ভাবনা তার নেই। কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে তার মন প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। ভোলাকে অহরহ ভেবে সে আর দিন কাটাতে পারছে না। শূন্য ঘর—সেই ঘরের মধ্যে একলা দিন যেন কাটে না। বাড়ীর খুব কাছেই রেল ইষ্টিশান, ছোট ছোট রেল লাইন, ইষ্টিশানও খুব ছোট; ভোরের গাড়ীটা যখন যায় তখনই কড়ি বরাবর ওঠে। আজকাল তার ঘুম ভাঙ্গে রাত্রি থাকতে। ঘরের কাজ সারা হয়ে গেলে তবে ভোরের গাড়ী আসে। কাজও যে কমে গেছে। একা মানুষ সে—এঁটো বাসন মাত্র একখানা। ঘরে পুরুষ মানুষকে নিয়েই তো যত কাজ। হাজারো অকাজ করে সে কাজ বাড়িয়ে দেয়। এখানে তামাকের গুল ঝাড়ছে, ওখানে ফেলছে পোড়া বিড়ি; বর্ষার সময় কাদা পায়ে—অন্য সময় ধুলো পায়ে একবারে এসে ঘরে ঢুকছে; এখানে গামছাটা ফেলছে; অকারণে কাস্তেটার ডগা দিয়ে উঠোনের কি দাওয়ার মাটি খুঁড়ছে; মাছ-ধরে এসে পুঁটি মাছ ধরা

ছিপটা ছুঁড়ে দিলে তো পড়ল গিয়ে ওইখানে; লাঙ্গলের গজাল ঠুকতে বসে এখানে ফেললে পাথরটা, ওখানে ফেললে লোহার টুকরোটা; কোদালের বাঁট তৈরী করতে বসে গাছের ডাল চেঁচে-ছুলে ঘরময় ছড়ালে কাঠের ছিলকে; লাউ কুমড়োর লতা চালের উপর তুলতে গিয়ে মেঝের উপর ফেললে রাজ্যের পচা খড়; কাজ করে আর কুলিয়ে উঠতে পারত না কড়ি। তার উপর ছিল তার সেবা। আজ পায়ের নখ তুলে এল—বাঁধ জলপটি। কাল এল হাত কেটে। পরশু 'নেসপেকটার' বাবুর ভারী বাক্সটা ঘাড়ে করে ঘাড়ে ব্যথা নিয়ে ফিরল—দাও নূনের পুঁটলীর সেঁক। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ফিরল তো কথাই থাকত না। মাথায় জল দেওয়া, বাতাস করা, তাকে খাওয়ানো, বমি করলে পরিষ্কার করা, তার উপর তার মার খাওয়া! ভোলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। আজকাল ভোরের গাড়ী আসতেই তার বাসিপাট হয়ে যায়, সে চুপ করে দাওয়ার উপর বসে থাকে দশটার গাড়ীর প্রত্যাশায়। দশটার গাড়ী এলেই হয় কাঠকুটো কুড়োতে যাওয়ার সময়। সমস্ত দুপুরটা মাঠের মধ্যে বাগানে বাগানে ঘুরে ফিরে আসে দুটোর সময়। তারপর আবার সেই একলা ঘরের মধ্যে কাটানো, বাকী দিনটা—সমস্ত রাত্রিটা! কড়ি হাঁপিয়ে উঠেছে। জাত জ্ঞাতের মেয়েরা কেউ কেউ আসে, কিছুক্ষণ বসে তারপর চলে যায়—যাই ভাই, এখুনি আবার ছেলে কাঁদবে। মরদের ফেরার সময় হল।

তারা চলে যায় কড়ি একা বসে থাকে। সন্ধ্যার সময় কেউ আসেই না। দিন রাত্রি কাটে না কড়ির।

মধ্যে মধ্যে দেব্‌না, যাকে কড়ি গালিগালাজ অভিসম্পাত না দিয়ে জল খেত না—সে-ই আসে। কিন্তু কড়ি আশ্চর্য হয়ে যায়—সে দেব্‌না আর নাই। দেব্‌নাও যেন পালটে গেছে। বাবুদের

ছেলেটার মতই সে যেন অন্য মানুষ, তার কথাবার্তার ধরণও অন্য রকম।

কড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ঠিক এই সময়েই বাইরে থেকে তাকে ডাকলে, কড়ি—

দেবেনই ডাকছে।

কড়ি ব্যগ্র হয়ে উত্তর দিলে—আয়, দেবেন আয়।

দেবেন এসে দাঁড়াল। বললে—তু লাকি বাবুদের বাড়ীতে চাকরি খুঁজতে গিয়েছিলি ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কড়ি বললে—হ্যাঁ।

দেবেন বললে—বাবুদের বাড়ীতে আজ আমি মুনিষ লেগে-ছিলাম কিনা, তাই শুনলাম।

কড়ি বললে—কি করব বল ভাই, প্যাটে খেতে হবে তো।

দেবেন বললে—মরণ তোর। ভোলা যা রেখে গিয়েছে—তাতেই তোর চলে যাবে। গাই গরুর দুধ বিক্রী কর, দু চার টাকা ধার দে লোককে, সুদ পাবি।

কড়ি আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—একলা ঘরে আমি আর থাকতে পারছি না দেবেন। ঘর যেন আমাকে গিলতে আসছে।

দেবেনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, কি করবি বল—মানুষের তো হাত নাই এতে।

কড়ির চোখে জল এল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে বললে—ছেরো জেবন কি করে কাটাব আমি বল ?

দেবেন বললে—অন্য কেউ হলে বলতাম সাঙা কর। কিন্তুক তোকে তো জানি। তোর ওই গুণেই ভোলা ছাড়ে নাই! তা' ধম্ম কম্ম কর—দেবতা থানে ঘোর। দিন কেটে যাবে।

ঝর ঝর করে কড়ির চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ হল।

দেবেন বলে—তোর হাতটান দোষটা যদি না থাকত, তবে তো তু মহাশয় লোক হতিস কড়ি। ভদ্দলোকেরাও বলে বাউড়ীর মেয়ে হলে কি হবে—কড়ির মত চরিত্ত হয় না। দোষের মধ্যে ওই হাতটান।

কড়ি নীরবে বারবার চোখের জল মুছবার চেষ্টা করলে—জল যেন মুছে সে শেষ করতে পারছে না।

দেবেনও অত্যন্ত দুঃখ পেলে কড়ির কান্না দেখে। সান্ত্বনা দিয়ে বললে—কাঁদিস না। আর কোথাও চাকরী টাকরী করতে যাস না। কোথা কোনদিন লোভ সামলাতে পারবি না, কি করে ফেলবি—তখন মহাবিপদ হবে।

একটু থেমে সে আবার বললে—তখন ভোলা ছিল, সে ছিল চৌকীদার, তা ছাড়া লোকে তাকে ভালবাসত; তখন তোর দোষ অনেক ঢাকা পড়ত—লোকে ক্ষমাঘেন্নাও করত। এখন মহাবিপদ হবে।

কড়ি আর থাকতে পারলে না। বললে, আমি উ কাজ করব না দেবেন। তোর দিব্যি (শপথ)। তু দেখিস!

এ কথায় দেবেন না-হেসে পারলে না। কড়ি তার দিব্যি করছে! 'দিব্যি' করে 'দিব্যি' ভঙ্গ করলে তারই অনিষ্ট হবে। তাতে কড়ির কি? তার মনে পড়ল যাত্রার দলে শোনা একটা ছড়া—'পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরে (শপথ) করে নিঘ্যাত।'

কড়ি অধিকতর ব্যগ্রতা ভরে বললে, মা কালীর দিব্যি।

দেবেন হাসতে হাসতেই বললে, দেবতার নাম নিয়ে দিব্যি করিস না কড়ি, থাক।

কড়ি বললে, যদি করি তবে হাতে যেন আমার কুষ্ঠ হয়।

দেবেন শিউরে উঠে বললে—না-না। ওসব বলতে নাই। বলিস না। বলেই সে আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

কড়ি ব্যগ্রভাবে তাকে ডাকলে—দেবেন, দেবেন।

দেবেন সাড়া দিলে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকের দুপুর বেলা রৌদ্রে যেন চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে। কাকগুলো পর্যন্ত গাছের ভিতরে বসে ঝিমোচ্ছে; কুকুরেরা ছায়াচ্ছন্ন ঠাণ্ডা জায়গায় বসে ধুঁকছে; জনমানবহীন পথ; চারিদিক নিঝুম; গৃহস্থের বাড়ী সব বন্ধ, যে যার দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে; শুধু একটানা বাতাসে তালগাছের পাতার আলোড়নে ঝরঝর শব্দ উঠছে, সে বাতাস আগুনের মত গরম, ধুলোয় ভর্তি। দুপুরটা যেন ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

কড়ি পথ দিয়ে চলেছিল। বিনা কাজে অকারণে চলেছিল। ঘরে বসে তার ভাল লাগেনি। তাই সে চলেছিল। এখন মাঠে কাটকুটো কুড়োতে যাওয়ার সময় সকাল বেলায়। জ্যৈষ্ঠের দুপুর বেলার রোদ বাতাসকে বলে ঝলা। জ্যৈষ্ঠের ঝলা লাগলে অনেক সময় মানুষ শুধু ঘেমে-ঘেমেই মরে যায়। আমাশয় তো সাধারণ অসুখ। তাই লোকে বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ দুমাস কাঠকুটো কুড়োতে যায় সকালে। তা ছাড়া কড়ি এখন সকালেও কাঠকুটো কুড়োতে যায় না। তার কারণ সকল বাগানেই আম কাঁঠালের গাছ, এখন আম কাঁঠাল পাকবার সময়, বাগানে ঢুকলেই নিশ্বাসের সঙ্গে বুক ভরে ওঠে পাকা ফলের মিষ্ট গন্ধে; অন্য মানুষের কথা কড়ি জানে না, কিন্তু ওই গন্ধ নাকে এলেই কড়ির মুখ জলে ভরে ওঠে, চোখ আপনা থেকেই গাছের মাথার দিকে ফেরে—সন্ধান করে কোথায় আছে উৎকৃষ্ট ফলটি। চুরি করবার দুর্বার প্রবৃত্তি—তার বুকের ভিতর যেন লক-লক করে ওঠে। তাই সে যায় না কাঠকুটো কুড়োতে। সে আর চুরি করবে না। কিছুতেই চুরি করবে না।

বাউড়ী পাড়া পার হয়েই গোবিন্দবাবুদের খিড়কী! খিড়কীর পুকুরটার পাড় দিয়েই একটা মানুষ হাঁটার সরুপথ, ও পথ দিয়ে পুরুষ যেতে পায় না, মেয়েরা যাওয়া-আসা করে। কড়ি সেই পথ দিয়ে চলেছিল। কোথায় যাবে তার কোন ঠিক ছিল না। সকাল থেকে বাড়ীতে বসে বাড়ীটাই তার অসহ্য বোধ হয়ে উঠেছিল, তাই সে চলে এসেছে। অস্পষ্টভাবে শুধু মনে হয়েছিল যদি দেব্‌নার দেখা মেলে তবে তাকে কয়েকটা কথা বলে আসবে। বলে আসবে, বুঝিয়ে দিয়ে আসবে, সে চুরি করে না। কিছুক্ষণ গল্পও করে আসবে। বাড়ী থেকে বার হতে গিয়ে মনে হল কাপড়খানা ময়লা। একটু ভেবে সে একখানা ফরসা শাড়ী পরলে। আরও একটু ভেবে মাথার চুলে একবার চিরুণী দিলে; তারপর একটা পান খেয়ে সে বার হল। কিন্তু দেবেন বাড়ীতে ছিল না। কোথায় খাটতে গেছে বোধ হয়। দেবেনের বাড়ীতেও কেউ নেই যে, জিজ্ঞাসা করে জানা যায়! সেখান থেকে বেরিয়ে অকারণে বিনা কাজেই সে চলেছিল।

বাবুদের খিড়কীর চারিপাশে খুব ঘন সারিবন্দী তালের গাছ। কোন একটা গাছের মাথার উপর বসে একটা চিল ডাকছে তীক্ষ্ণস্বরে। উঃ কি তীক্ষ্ণ স্বর! এই ঝাঁ ঝাঁ করা দুপুরের আগুনের তপ্ত ঝরঝরে ঝড়ো বাতাস চিরে চলেছে যেন।

ও কে? কে যেন ঘাট থেকে উঠে চলে গেল। বাবুদের বাড়ীরই কোন বউ কি মেয়ে হবে। ঝলমলে শাড়ী, আর মেয়েটির অনাবৃত একটি হাতের গয়নাগুলি দুপুরে রৌদ্রের ছটায় ঝকমক করছে। পিছন দিক থেকে কড়ি ঠিক চিনতে পারলে না।

ঘাটের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল। বাঁধানো ঘাটের ঠিক মাথার উপরেই মেয়েটির আলতা পরা পায়ের ভিজে ছাপ পড়েছে, আলতার ছোপ আঁকা গোটা পাখানির ছাপ উঠে গেছে সানের

উপর। ছাপ একটি নয়, বরাবর চলে গেছে জল পর্যন্ত। সধবা ভাগ্যমানী মেয়ে।

ওটা কি? একেবারে জলের ধারের সিঁড়িটার উপর ওটা চক্‌চক্‌করছে কি? কড়ির বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করে উঠল। জনহীন চারিদিক—কড়ি একবার চারিটা দিক ভাল করে দেখে নিলে, তারপর অত্যন্ত সন্তর্পিতভাবে পা ফেলে সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়াল। কানের একটা দুল। খসে পড়ে গেছে, বউটি জানতে পারেনি। গিনি সোনার দুল—রৌদ্রের ছটায় আগুনের মত জ্বলছে। বউটি জানতে পারেনি, কোন রকমে আলগা হয়ে গিয়েছিল, পড়ে গেছে। কিন্তু শব্দও কি হয়নি? নিশ্চয় হয়েছিল, বউটির খেয়াল ছিল না। খেয়াল হবে কি? কড়ির মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। জানতে পারবে কি? বাড়ীতে হয়তো তার স্বামী তার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। তার কি খেয়াল থাকে, না থাকতে পারে?

উঃ, আগুনের মত জ্বলছে! কড়ি খানিক হেঁট হল কুড়িয়ে নেবার অভিপ্রায়েই। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে সোজা হয়ে উঠে—ছুটে—হ্যাঁ ছুটেই সেখান থেকে পালিয়ে গেল। না—সে ও কাজ আর করবে না।

দু পাশে ভদ্রজনদের বাড়ী নিস্তব্ধ। লোকজন সব ঘুমুচ্ছে। কড়ি প্রত্যেক বাড়ীটিরই হালহদিস জানে—কোন কোন বাড়ীর কোনখানে ভাঙা গোপন প্রবেশপথ আছে সে তার নখদর্পণে। বাড়ীতে শাড়ী শুকুচ্ছে, রঙীন শাড়ী, সৌখীন পাড়ওয়ালা শাড়ী, একটা বাড়ীতে শান্তিপুরে শাড়ীও ঝুলছে একখানা। কড়ির বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করছে। সে প্রাণপণে ছুটছে। অনেকটা এসে পড়ল। বাবুদের বৈঠকখানার সারি—দুপাশে বাবুদের বৈঠকখানা, মাঝখান দিয়ে পথ। এখানে এসে সে থামল। এখানে

থাকবার মধ্যে আছে দু-চারটে ফলের গাছ, খড়। ধানের মরাই।
কড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে চলছিল।

সামনেই সেই বাবুদের বৈঠকখানা।

কড়ি দাঁড়াল। তার বুকের ভিতরটা অপূর্ব সান্ত্বনায় আনন্দে ভরে উঠল—সে আজ 'সোণার দব্যি' (দ্রব্য) হেলায় ফেলে দিয়ে এসেছে, ছোঁয় নাই। আঃ। বাবুদের সেই ছেলেটিকে এ কথাটা বলতে পারলে তবে তার তৃপ্তি হয়।

বাবুদের বৈঠকখানায় হাসির আওয়াজ উঠছে।

—ছক্কা—ছক্কা—ছক্কা। কলরব উঠল। দুপুরবেলা ঘরে দরজা দিয়ে তাস খেলছে বাবুরা।

কড়ি আর থাকতে পারলে না, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

সকলে বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালে। সেই বাবুটি বললে—কি? কি চাই তোর?

কড়ি বুঝতে পারলে না কি বলবে।

—কি চাই এখানে? রূঢ়স্বরে সে প্রশ্ন করলে।

কড়ি ঢোঁক গিলে বললে, আজ্ঞে জন্ম-মিত্যুর খাতাটা—নিকে নোব।

সে অবাক হয়ে কড়ির মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুই খেপে গিয়েছিস নাকি?

—আজ্ঞে।

—ভোলা ম'রে গেছে, জন্মমৃত্যুর খাতার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি? সে তো লেখাবে নতুন চৌকীদার।

কড়ি এবার একরকম ছুটেই পালিয়ে এল। তবুও দাওয়া থেকে নামবার সময় সে শুনলে একজন বলছে, ব্যাপার কি? পাগল?

—না—না। মেয়েটা পাকা চোর। বোধ হয় দুপুরবেলা চুরি করতে বেরিয়েছে।

—কিন্তু দেখতে তো বেশ মেয়েটা।

—ওদিকে চেয়ো না।

—কেন?

—চোর হোক, ছোট লোক হোক, মেয়েটি কিন্তু সেদিকে আশ্চর্য রকম ভাল। সত্যিকার সতী মেয়ে।

কড়ি ছুটে পালিয়ে এল।

সন্ধ্যেবেলা কড়ি ওই কথাই ভাবছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যা, চারিদিক এখনও গরম হয়ে আছে—তবুও হাওয়া অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কড়ি উঠোনে একখানা চ্যাটাই পেতে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিল। আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে। অকারণে তার কেবল কান্না আসছে। এমনি গরমের সময় চাঁদনী রাত্রে ঠিক এই খানটিতেই চ্যাটাই বিছিয়ে সে আর ভোলা বসে থাকত। কোন দিন সে শুয়ে থাকত, ভোলা বসে তামাক খেত, কোনদিন বা ভোলা শুয়ে থাকত, কড়ি দিত তার মাথার চুল টেনে। একটা মানুষের অভাবেই ঘরখানা খাঁ খাঁ করছে। পাড়াপড়শীর ঘরে গেলে সঙ্গ পাওয়া যায়, কিন্তু কড়ি সে যায় না। ভোলা থাকতে তো যেতই না, এখনও যায় না। লোকে সন্দেহ করে। তার মনে পড়ে গেল, সে আজ 'সোনার দব্যি' হেলায় ফেলে দিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু বাবুদের ছেলেটা তাকে বললে—। সত্যিই তার চোখ জলে ভরে গেল।

—কড়ি! কড়ি রইছিস?

কড়ির বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। দেব্‌না। দেবেনের গলা। দেবেনকে সে বলবে আজকের কথা।

—কড়ি!

—দেবেন! এস।

—অঃ। তু যে একবার কি হলি—এস বলছিস।

—তোমাকে খাতির করছি।

—খাতির! তা—। দেবেন হাসলে। তা খাতিরের খবর এনেছি তোর লেগে।

কড়ি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেবেনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—বস। ভারী গোপন কথা ভাই।

—বল। কড়ির গলা কাঁপতে লাগল।

—আগে দিব্যি কর, কাউকে বলবি না।

—কালীর দিব্যি। কাউকে বলব না।

—গোপালপুরের হরেরাম পোদ্দারকে জানিস?

—হরেরাম পোদ্দার? তার তো জ্যাল হয়েছিল—সেই ডাকাতির মাল সামালের লেগে।

—সে ফিরে এসেছে।

—ফিরে এসেছে?

—হ্যাঁ। এসেই ভোলার খোঁজ করছিল। তা আমি বললাম, ভোলা নাই। তা বললে—যাক্ ফাঁসী থেকে বাঁচলাম। বেঁচে থাকলে খুন করতাম। তারপর তোর কথা শুধালে।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ। পোদ্দারের সঙ্গে আমার অনেক দিনের জানাশোনা কিনা। পোদ্দারের ঘরে চাকরী করেছি অনেক দিন। তাই হরেরাম এসেই আমাকে ডেকেছিল।

কড়ি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

—পোদ্দার বললে তোর কথা। বললে, ভোলা মরে গিয়েছে, কড়ি আর সাঙা করবে না বলছিস—তখন কড়ি যদি আমার কথা মাফিক কাজ করে, তবে সব দায়-হায় আমার।

কড়ি বললে—না।

—না লয় শোন। চুরি চামারি যা করবি পোদ্দারকে দিবি। পোদ্দার তার দাম দেবে। ধরা পড়লে মামলা মোকদ্দমা করতে হয় তাও করবে।

—না। না।

—ওই দেখ, ক্ষেপামী করিস না। নইলে তোর এবার জ্যাল ঘিঘ্যাস্ত তা বলে রাখলাম। এই তো আজই শুনলাম—তুপুর বেলায় বাবুপাড়ায় ঘুরছিলি। বাবুদের বঠকখানায় ঢুকেছিলি। লোক দেখে বলেছিস জন্মমিত্যুর খাতা নেকাতে গিয়েছিলি।

—না—না।

—আর না। শোন্, আজকে ভাব, ভেবে কাল বলিস আমাকে।

দেবেন চলে গেল। কড়ি মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

পরদিন বেলা তখন জলখাবার বেলা। মুনিষজনের জলখাবার বেলা। মুনিষজনেরা জলখাবার ছুটি পেয়ে বাড়ী ফিরছে। দেবেন বাড়ীর পথে কড়ির বাড়ীতে গিয়ে ঢুকল। এতক্ষণ কড়ি নিশ্চয় ফিরেছে কাঠ কুটো কুড়িয়ে।

—কড়ি। কই কড়ি? কড়ি! অ কড়ি। ওই তো কুটো কুড়োবার ঝুড়িটা পড়ে রয়েছে। চারিদিক চেয়ে দেবেন দেখলে ঘরের দরজার শেকল খোলা রয়েছে—শুধু ভেজানো আছে। কড়ি কি ঘরে শুয়ে আছে? দরজা ঠেলে দেবেন অবাক হয়ে গেল। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ।

—কড়ি! কড়ি! কড়ি! কড়ি!

উদ্বেগপূর্ণ কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সে দরজায় ধাক্কা দিলে। পরক্ষণেই কিন্তু তার ভয় হল। সে ছুটে বেরিয়ে এল কড়ির বাড়ী থেকে। ছুটে গেল পাড়ার মাতব্বর নোটনের কাছে।

লোকজনের মধ্যে কে যে উৎকণ্ঠিত কৌতূহলের আতিশয্যে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে সে কথা ঠিক কেউ জানে না—কিন্তু দরজাটা খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে কড়িকাঠে দড়ি টানিয়ে কড়ি গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।

নোটন বললে—বেরিয়ে আয় সব। কেউ কিছু নাড়িস না, থানায় খবর দে।

দারোগাবাবু 'সুরতহাল' রিপোর্ট লেখা শেষ করলেন—

'মেয়েটির আত্মহত্যার কারণ কিছু জানা যায় না। তবে যে রূপ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে স্বামীর মৃত্যুর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়াই এরূপ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ মৃত স্বামীর প্রতি গভীর আসক্তি ছিল মেয়েটির। অথবা মেয়েটি কোন কিছু চুরি করিয়া ধরা পড়িবার আশঙ্কায় এরূপ করিয়াছে এমনও হইতে পারে। কারণ মেয়েটি স্বভাব-চোর ছিল। পূর্বে পূর্বে বহুবার চুরি করিয়াছে। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, গতকাল দ্বিপ্রহরে সে চুরির অভিপ্রায়েই ভদ্রপল্লীতে ঘোরাফেরা করিয়াছে।'

দারোগা উঠলেন, বললেন—লাস জ্বালিয়ে দিতে পার তোমরা।

॥ দেবতার ব্যাধি ॥

দীর্ঘকাল পরে বুড়ো হেডমাষ্টার চিঠি পেলেন—ডাক্তার গরগরির কাছ থেকে। ডাক্তার গরগরি! কতকাল আগের কথা! অনেক দিন আগের কথা। ঠিক কতদিন হ'ল কারোই মনে নেই। তবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে এতে আর ভুল নেই।

ছ'ফুটের উপর লম্বা একটি মানুষ, পাতলা হিলহিলে কাঠামো, মাথাটি ছোট, টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত নাক, চোখ দুটিতে কোন বিশেষত্ব না থাকলেও চোখের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত রুক্ষ—তীব্র; এই ছিল গরগরি ডাক্তারের চেহারা। ডাক্তার এসে উঠল—সন্ন্যাসীচরণ প্রধান মশায়ের নটকোনের দোকানে। দোকানের পাশেই ছিল ছোট ছোট দুটি কুঠরী—সেই কুঠরী দুটি ভাড়া নিয়ে প্রথমেই টাঙিয়ে দিলে দুটি টিনের পাতে লেখা সাইনবোর্ড। একটায় ইংরিজীতে লেখা Doctor Gargari, Experienced Physician, অপরটায় বাংলায় লেখা—ডাক্তার গরগরি, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। লোকে ঠাট্টা করে নাম দিলে ডক্টর গ্রে-গরী।

রাঢ়দেশের পল্লীগ্রাম—গণ্ডগ্রাম অবশ্য বলা চলে, সপ্তাহে দুদিন হাট বসে, ছোটখাট বাজারও আছে; মিষ্টির দোকান, নটকোনের দোকান, কাপড়ের দোকান, মণিহারী দোকান, কাটা কাপড়ের দোকান না থাকলেও বৈরিগী খোঁড়া, আর তিনু মিয়া দুজনের দুটো সেলাইয়ের কল চলে—একটা বাজারের এ-মাথায় একটা ও-মাথায়। কিন্তু বাজার হাট সব এই দিকে সত্ত্বেও গ্রামের যাকে বলে মুখপাত—সেটা এদিকে নয়। সেটা হল ভদ্রলোক পাড়াতে। সে আমলের কথা। তখন টাকা পয়সা যার যতই

থাক, জমিদারেরাই ছিল সমাজের প্রধান। গ্রামটির ভদ্রলোক পল্লীটির চেহারা ছিল বেঙাচি ভরা খিড়কী ডোবার মত। জমিদারে জমিদারে প্রায় শিবময় কাশীধামের মত অবস্থা। বছরে পঞ্চাশ-একশো-ছুশো-পাঁচশো হাজার-ছহাজার আয়ের জমিদার সব। তিন চার ঘর চার পাঁচ হাজারী, এক ঘর পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়ছেন দিন দিন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত। ঘরে ঘরে মজলিশ বসে, কাছারী হয়, খানা-পিনা গীত বাদ্য হয়, রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত আসর সরগরম থাকে। ডাক্তার ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্ন্যাসী প্রধান মশায়কে বলত—আই ডোণ্ট কেয়ার! ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি মিঃ প্রডানা?

সন্ন্যাসীচরণ ইংরিজী বুঝতো না। সে ডাক্তারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—কি বলছেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার গরগরি বললে—ওদের আমি গ্রাহ্যও করি না। বলে হাসলে। বোধ হয় কথাটাকে একবার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বললে, আপনাদের ওই জমিদারদের!

তারপর ডাক্তার বের হল—সাজগোজ ক'রে বিকেল বেলা বেড়াবার জন্যে। ডক্টর গ্রেগ্ররী বলে—ইভনিং ওয়াক। মর্ণি ওয়াক অবশ্য সব চেয়ে ভাল—বাট ইউ সি (but you see) ভোরে ঘুম আমার ভাঙে না। আবার হেসে বলে—ইট ইজ এ ডক্টরস ডিজিজ! সব বড় ডাক্তারের ঘুম ভাঙে নটার পরে! বলে' সে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে বেরিয়ে পড়লে। ছ'ফুট লম্বা ডাক্তারের মাথায় একটা গুজরাটি কালো টুপি, গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুল চায়না কোট, পরণে সাদা থান কাপড়, পায়ে সে আমলের হুড বার্ণিশ—পাশে স্প্রিং দেওয়া জুতো। মুখে একটি সিগার। কড়া সিগারের গন্ধে রাস্তার লোকে নাকে কাপড় দেয়। ডাক্তার তাদের দিকে তাকিয়ে বলে—আন্‌সিভিলাইজড ক্রীচারস! ডাক্তারও নাকে

রুমাল দেয়—বাড়ীর পাশের ড্রেণগুলো দেখে। বলে, 'ডার্টি—সুইন্সেস! তাদের বেশ-ভূষার দিকে হাঁ ক'রে যারা চেয়ে থাকে তাদের সে বলে—হামবাগ!

পশ্চিম রাঢ়ের পল্লী, লোকেদের কথায় বিচিত্র টান, ঐকার, একার, চন্দ্রবিন্দু, ড়কারের ছড়াছড়ি; গিয়েছে হয়েছের স্থলে বলে—গৈছে, হইছে; 'কেন'কে বলে কেনে; 'খেয়েছি'কে বলে 'খেঁয়েচি'; 'হারকে 'হাড়'; রামকে বলে 'ড়াম', নিতান্ত নিম্নস্তরের লোকে আবার রামকে বলে 'আম'; আর আমকে বলে 'ড়াম'। ডাক্তার শুনে বলে—"বারবেরিয়ানস! ব্রুটস!" বাংলাতে বলে—অনার্য—বর্বরের দেশ।

বাজারের ভিতরের রাস্তাটা ধরে সে বরাবর চলে গেল ইস্কুলের দিকে। এখানে একটি এম-ই ইস্কুল আছে। পথে থানা। সে আমলের থানা, খানকয়েক চেয়ার, দুখানা টেবিল থাকলেও তক্তাপোষের আধিক্য ছিল বেশী. দারোগা-বাবুরও ভুঁড়ি ছিল। তক্তাপোষের উপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে পান চিবুচ্ছিলেন আর গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। হঠাৎ এমন সজ্জায় সজ্জিত ডাক্তারকে দেখে তিনি ডাকলেন—চামারী সিং! দেখো—তো উ কৌন যাতা হ্যায়!

চামারী সিং পালোয়ান লোক, সে এসে গম্ভীর ভাবে বললে—এ বাবু সাব।

মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে ডাক্তার অল্প একটু পাশ ফিরে বললে—ইয়া-স? 'ইয়েস'কে ডাক্তার বলে—ইয়া-স, লম্বা করে টেনে উচ্চারণ করে।

চামারী ঈষৎ চকিত হয়ে গেল—বললে, আপকে দরোগা-বাবু বোলাতে হেঁ।

—Wha—t? বোলাতে হেঁ? why? কাহে? আই এ্যাম

নট এ চোর, নট এ জুয়াচোর, নায়দার এ ডেকইট—নয় এ ফেরারী আঁসাইমী। Then why? থানামে কাহে যায়েগা?

চামারী উত্তরোত্তর ভড়কাচ্ছিল, তবুও সে থানার জমাদার লোক, সে বললে—কেয়া নাম আপকে? পাতা কেয়া? কাঁহা আয়ে হ্যায় হিঁয়া—বাতাইয়ে তো!

ডাক্তার পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে চামারীর হাতে দিয়ে বললে—সব লিখা হায় ইসমে। দেও—তুমহারা দারোগা-বাবুকো! বলেই আবার চুরোটটা মুখে দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে অগ্রসর হল।

পথে কয়েকটা কুকুর টুপি পরা অপরিচিত এই মানুষটিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল! ডাক্তার হাতের ছড়িটা তুললে বিরক্তি ভরে; দেখতে সৌখীন হলেও তার ছড়িটা বাবুছড়ি নয়, দস্তুরমত যষ্টি। পাকা বেতের এবং মোটা অর্থাৎ বেড়ে প্রায় সে-আমলের ডবল পয়সার মত, তার ওপর ডাক্তারের মত লম্বা মানুষের উপযুক্ত লম্বা; দু চার ঘা বেশ দেওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলে ডাক্তার ছড়ি নামিয়ে নিলে—কুকুরগুলোকেই বললে, দ্যাটস গুড। বিশ্বাসী গ্রামভক্ত কুকুর! এটো কাঁটার নুন খেয়ে নিমকহালাল! এ্যাঁ! দ্যাটস গুড!—বলেই আবার অগ্রসর হল।

গ্রামের প্রান্তে এম-ই ইস্কুল। খড়ো বাংলা ধরণের লম্বা বাড়ী। পাশেই একটা কোঠাঘরে হেডমাষ্টার থাকেন। প্রবীণ লোক। বাসার সামনে বেঞ্চি পেতে হুকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। আর খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সে আমলের কাগজ—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, অবশ্য ইংরিজী। ডাক্তার তার সামনে এসে দাঁড়াল—হ্যালো, আর ইউ দি ভেনারেবল হেডমাষ্টার অব দিস স্কুল?

হেড মাষ্টার উঠে দাঁড়ালেন। —ইয়েস! বলে সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাক্তার বললে,

গুড ইভনিং! তারপর নিজের একখানি কার্ড বের করে হেড-মাষ্টারের হাতে দিয়ে বললে—এখানে প্র্যাক্‌টিস করতে এসেছি আমি। বাট ইউ সি—জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন আছে। আই হ্যাভ কাম টু আস্ক ইউ টু বি এ ফ্রেণ্ড অব মাইন।

হেডমাষ্টার হেসে বললেন—বস্থন, বস্থন।

—লেট মি হ্যাভ ইয়োর হ্যাণ্ড ফার্ষ্ট! মাষ্টারের হাতখানি নিয়ে হ্যাণ্ডশেক ক'রে ডাক্তার বসল।

মাষ্টার মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় উঠেছেন? এখানে আর কেউ জানাশোনা আছে কিনা? দেশে কে-কে আছে? কোথায় দেশ? কেমন অবস্থা সে কথাও ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন।

বেঞ্চের উপর বসে ডাক্তার তার লম্বা পা-দুখানির একখানি নাচাতে নাচাতে উত্তর দিলে আর চুরুট টানল। শেষের প্রশ্নের উত্তরে বললে, দেশ কলকাতার কাছেই। মা আছেন—তিনি থাকেন কাশীতে। স্ত্রী আছেন পুত্র আছেন কন্যাও আছেন। গরীব মানুষ আমি হেডমাষ্টার—এ পুয়োরম্যান।

মাষ্টার প্রশ্ন করলেন—এখানেই যখন থাকবেন তখন নিয়ে আসবেন তো এখানে?

ডাক্তারের পা দুটো ঘন ঘন নাচতে আরম্ভ করলে—নো হেডমাষ্টার, সে আইডিয়া আমার নেই।

—তা হ'লে? তাঁরা সেখানে থাকবেন কার কাছে?

—ও! ডাক্তার বল্‌লে—তাদের আমি বাপের বাড়ীতে আই মী-ন আমার শ্বশুরবাড়ীতে রেখে এসেছি! সেইখানেই তারা থাকবে। একটু চুপ করে থেকে অনেকটা যেন হঠাৎ আবার বললে—ইয়াস হেডমাষ্টার, সেইখানেই তারা থাকবে। এখানে আনার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

এরপর সে প্রায় চুপ করেই গেল এবং অত্যন্ত দ্রুতভঙ্গীতে পা নাচাতে আরম্ভ করলে।

হেড মাষ্টার বললেন—চলুন আমি যাব গ্রামের দিকে। ভদ্র-লোকেদের সঙ্গে আলাপ হবে। চলুন।

ডাক্তারও উঠে দাঁড়াল—সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে টুপি মাথায় চায়না কোটপরা লম্বা লোকটিকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, স্থির সুদীর্ঘ একটি রেখার মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে—গুড নাইট, হেডমাষ্টার!

—সে কি? গ্রামের মধ্যে যাবেন না?

—নো। মাফ করবেন হেডমাষ্টার। তাঁরা সব ধনী ব্যক্তি, পুরুষানুক্রমে জমিদার। আমি একজন গরীব মনুষ্য। খেটে খাই। Water and oil ইউ সি, হেডমাষ্টার—কখনও মিশ খায় না। গুড নাইট!

কথাটা গ্রামে অজানা রইল না কারুর। জানাতে অবশ্য বারণ করেনি ডাক্তার, কিন্তু ঢাক বাজিয়ে বলার মত ইচ্ছেও তার ছিল না। ঢাক বাজিয়ে যে কথাই বলতে যাক—তাতে গলাই শুধু উঁচুতে চড়ে না, রঙ চড়ে কথাও ফলাও হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। গাঁয়ের বাবুপাড়ায় কথাটা ঘোরাল এবং জোরাল হয়ে আলোচিত হ'তে আরম্ভ হ'ল। কেউ বললে, ডাক্তার বলেছে—গুণ্ডার দল সব; না কামিয়ে দর্জি। বাপের পয়সায় খায় নিষ্কর্মার দল। মাতাল। লম্পট। অত্যাচারী।

ডাক্তারও শুনলে। শুনে হেসে বললে, ওরা নিজেরা নিজেদের সত্যি বিশেষণগুলো রাগের মাথায় আমার কথা ব'লে বলে ফেলছে। ওর কোনটা আমার কথা নয়।

কেউ বললে, ডাক্তার বলেছে—ইতর, ওদের আমি ঘেন্না করি। বলে থু থু করে থুথু ফেলেছে।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললে, না। একথা আমি বলতে পারি না।

বাবুরা বললে, দেখে নেব আমরা।

ডাক্তার একথারও কোনো জবাব দিলে না। শুধু হাসলে।

বাবুরা প্রায় হুকুম জানিয়েই প্রচার করে দিলে—ওকে বাবুরা কেউ ডাকবেই না। অন্য লোকেও যেন না ডাকে। দারোগা-বাবুর সঙ্গে বাবুদের খুবই সদ্ভাব। দারোগা-বাবুও সে মজলিশে ছিলেন।

সন্ন্যাসী প্রধান বললে—ডাক্তারবাবু, কাজটা ভাল হচ্ছে না। চলুন একদিন বাবুদের ওখানে যাই! গেলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

ডাক্তার নিবানো আধখানা চুরুটটি কামড়ে ধরে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে ফেললে, বললে—বাবুরা আপনার যদি ক্ষতি করতে পারে বলে মনে করেন সন্ন্যাসী বাবু, বলবেন আমাকে—আমি তা হ'লে চলে যাব আপনার এখান থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বাবুদের টমটমে চামারী সিং ছাতা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল একটি ছেলেকে —দশ বারো বছরের ছেলে। ছেলেটি চীৎকার করে উঠল—ও মাগো—ও বাবারে! প্রায় সে নেতিয়ে পড়ে গেল টমটমের উপর। চামারী সিং ব্যস্ত হয়ে উঠল, টমটমের কোচম্যানকে বললে—রোখো! গাড়ীটা দাঁড়াল।

চামারী লাফ দিয়ে নেমে সন্ন্যাসীকে বললে—থোড়া পানি দিবেন তো প্রধান মাশা।

ডাক্তার উঠে এগিয়ে গেল গাড়ীর কাছে। ছেলেটি পেট ধরে কাতরাচ্ছে। চামারী জল আনতেই ডাক্তার প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে এর?

চামারী বললে—দরোগা বাবুর লড়কা।

—লড়কা তো বটে। কি হয়েছে?

প্রধান বললে—ভারী দুঃখের কথা ডাক্তার বাবু, ছেলেটির এই বয়সেই অম্বলশূল হয়েছে।

—আই সি। তা' এই রোদ্দুরে এই অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

—কালীতলা। পাশের গাঁ দেবীপুরে ভারী জাগ্রত কালীমা আছেন—সেইখানে যাচ্ছে। ফি মাসে অমাবস্যেতে যেতে হয়। কালী মায়ের ওখানেই পড়েছে শেষ পর্যন্ত।

—হুঁ। কে বললে শূল বেদনা?

—মা কালীর ভরণে বলেছে।

ডাক্তার বললে—হামবাগ।

চামারী বিব্রত হয়ে প্রধানকে বললে—কি করি হামি প্রধান মাশা?

ডাক্তার নিজেই ছেলেটিকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে এনে শোয়ালে। চামারীকে বললে—বোলাও তোমার দরোগা বাবুকে। যাও। বলছি।

ডাক্তার দারোগাকে বললে—শূল ফুল নয়। এ আপনাদের মা কালীর বাবারও সাধ্যি নেই যে ভাল ক'রে দেয়। বুঝলেন?

দারোগা অবাক হয়ে গেলেন, বিশেষ করে ডাক্তার যখন মা কালীর বাবা তুলে জোর দিয়ে বললে—তখন আর তিনি কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। কারণ কালীকেই তিনি ভাল ক'রে জানেন না অথচ ডাক্তার তার বাবার সংবাদ পর্যন্ত জানে। সে ক্ষেত্রে তিনি আর কি জবাব দেবেন?

ডাক্তার বললে—আমি ভাল ক'রে দিতে পারি। কিন্তু ফি

দু টাকা, ওষুধের দাম এক টাকা—তিন টাকা লাগবে। ভাল না হয় টাকা ফেরত দেব আমি।

দারোগা বললেন—ওষুদ দিন, আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চুরুটে টান দিয়ে ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত নিরাসক্ত হয়ে গেল যেন, বললে—ধারে কারবার আমি করি না।

চামারী সিং দৌড়ালো, সন্ন্যাসী ব্যস্ত হয়ে বললে, আমি টাকা দিচ্ছি ডাক্তার বাবু।

—দেবেন তাতে আমার আপত্তি কি আছে? কিন্তু আপনি ফেরৎ পাবেন তো?

ডাক্তার ওষুদ দিলে। একটা পুরিয়া আর একদাগ ওষুদ। বললে—পাইখানা হবে। ভয় পাবেন না।

কিছুক্ষণ পর দারোগা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন—পাইখানার সঙ্গে নাড়ীর মত লম্বা কি বেরিয়েছে। ডাক্তার বললে—শূল বেরুচ্ছে। কৃমি—কৃমি! ছেলের পেটে কৃমি ছিল!

—এত বড় কৃমি?

—হ্যাঁ। ভাল হয়ে গেল শূল বেদনা। যান বাড়ী যান। তারপর আবার বললে—আপনার মাথাতেও দেখছি কৃমি আছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে রকম! হাসতে হাসতে আবার বললে—ওর ওষুদ আমার কাছে নেই। যান বাড়ী যান। প্রধান মশাইয়ের টাকা তিনটে দিয়ে দেবেন। বুঝলেন?

এক চিকিৎসাতেই ডাক্তারের পসার জমে গেল। দারোগা প্রত্যেককে বললেন—ধন্বন্তরি। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

ডাক্তার এতেও হাসে। এ হাসি কিন্তু অন্য রকম। ডাক্তারের হাসিতে কথায় যে একটা ধারালো ভাব আছে সেটা নেই এ হাসিতে। সন্ন্যাসীচরণও একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। ডাক্তার সন্ধ্যায়

হেডমাষ্টারের ওখানে যেতেই হেডমাষ্টার হেসে বলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, রাতারাতি বিখ্যাত ব্যক্তি!

ডাক্তার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে লম্বা ঘাড়টা একটু তুলে আপন মনে চুরুট টেনে যায়। আসর জমে না।

হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করেন—কি ব্যাপার ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে চুরুটটার দিকে তাকিয়ে বলে—নাথিং হেডমাষ্টার!

—তবে?

ডাক্তার কোন উত্তর না দিয়ে বসে থাকে চুপ করে। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে, আকাশে তারা ফুটে ওঠে; ডাক্তার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বলে—হেডমাষ্টার!

—বলুন।

—এ গুলো ঠিক আমি পছন্দ করি না।

—কি? কি পছন্দ করেন না? ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—ব্যাপার কিছু নয়। এই যে অনাবশ্যক অনুচিত অবাঞ্ছনীয় কৃতজ্ঞতা—; দারোগার ছেলেটার কৃমি হয়েছিল পেটে, অত্যন্ত সাধারণ সোজা অসুখ, এক পুরিয়া স্যাণ্টোনাইন—এক ডোজ ক্যাষ্টার অয়েলে ভাল হয়ে গেল; আমি তার জন্যে দু'টাকা ফিজ—এক টাকা ওষুদের দাম নিয়েছি। তবুও দারোগা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গেল, চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছে, আমি ধন্বন্তরি—এ গুলো অত্যন্ত—অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় মনে করি।

হেডমাষ্টার অবাক হয়ে গেলেন।—কি বলছেন ডাক্তার বাবু? মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

—না। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর যত রূঢ় তত দৃঢ়; হেডমাষ্টার খানিকটা আহত হলেন মনে মনে ডাক্তারের কথা বলার এই ধরণের জন্য। তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে বেশ শক্তভাবেই

জবাব দিলেন—আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না আমি।

—ইউ আর এ ফু-ল!

—কি বলছেন আপনি?

—ইউ ডোণ্ট নো হেডমাষ্টার। ইউ ডোণ্ট নো। এই ধরণের কৃতজ্ঞতা—ব্যাড, ভেরী ব্যাড—অত্যন্ত খারাপ।

হেডমাষ্টার দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলেন—কখনও না। এটা আপনার মনের দোষ!

ডাক্তার আবার বললে—ইউ আর এ ফু-ল!

এরপর ডাক্তারের সঙ্গে হেডমাষ্টারের আরম্ভ ঈষদুষ্ণ তর্ক—ক্রমশঃ সে উষ্ণতা বাড়তে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর—অত্যন্ত রূঢ় তীব্র উচ্চধ্বনিতে হচ্ছিল। বলতে ভুলেছি—ডাক্তারের কণ্ঠস্বরটাই তীক্ষ্ণ, সরু আওয়াজ; কিন্তু ছফুট উঁচু ডাক্তারের আকৃতির মতই প্রস্থে কম হলেও বর্ষা ফলকের মত দীর্ঘ এবং ধারালো।

ইস্কুলের সঙ্গে লাগাও একটা ছোট বোর্ডিং আছে;—এই বাদ প্রতিবাদের উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে ছেলেরা অন্ধকারের মধ্যে অদূরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই হেডমাষ্টার চুপ করে গেলেন। তিনি আসন ছেড়ে উঠে স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন ছেলেদের দিকে। মৃদু গম্ভীর স্বরে বললেন—বয়েজ, যাও-যাও পড়গে যাও! চল-চল! বলে তিনিও চলে গেলেন ছেলেদের সঙ্গে! ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর উঠল এবং উচ্চৈঃস্বরে বললে— হেডমাষ্টার, আমি চললাম। গুড নাইট!

কয়েক দিনের মধ্যেই ডাক্তারের খ্যাতি আরও বেড়ে গেল। খ্যাতি বই কি। সু কিম্বা কু সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠা যে ডাক্তারের বাড়ল তাতে আর সন্দেহ নেই।

লোকে বলতে লাগল—ভারী তেজী ডাক্তার। আগুন একেবারে।

কেউ বললে—ডাক্তার ভাল হলে কি হবে। যেমন দুর্মুখ তেমনি চামার।

কেউ বললে—পাষণ্ড।

দারোগা একদিন নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন, ডাক্তার তাঁকে প্রায় হাঁকিয়ে দিয়েছে।—না-না-না ও সব আমার অভ্যেস নেই। রোগীর বাড়ী ফিজ নিই, চিকিৎসা করি। নেমন্তন্ন খাই না।

মানুষ মরছে কি ম'রে গেছে—সেখানেও ডাক্তার ফি-এর জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দয়ার জন্যে কেউ কাকুতি করলে বলে—দয়া করতে আমি আসিনি এখানে, স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ী ছেড়ে। ফিজ ছাড়তে আমি পারব না। না দিতে পার—ডেকো না আমাকে।

হেডমাষ্টারের সঙ্গে পরের দিনই আবার মিটে গেছে। হেডমাষ্টারকে বলে—বিনা বেতনে আগেকার গুরুদের মত ছেলে পড়াতে পারেন আপনি ?

হেডমাষ্টার চুপ করে থাকেন। এই উগ্র মস্তিষ্ক লোকটির সঙ্গে কোন মতামত নিয়ে আলোচনা করতে তিনি চান না। বিশেষ ক'রে যেখানে সামান্য মত-বিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

ডাক্তার পা নাচাতে সুরু করে। চুরুট টানতে টানতে বাঁকা সুরে বলে—অবশ্য এর চেয়ে তাতে লাভ বেশী হেডমাষ্টার।

হেডমাষ্টার মৃদু হাসেন।

ডাক্তার বলে—আরুণি গুরুর আল বাঁধতে গিয়ে জল আটকে শুয়ে থাকে। উতঙ্ক দেব-দুর্লভ কুণ্ডল এনে দেয় গুরুপত্নীর জন্য। গুরু থেকে—ধন-রত্ন-মণি-মাণিক্য সব পাওয়া যায়। এমন কি শিষ্যের জীবনও চাইলে পাওয়া যায়।

আবার একটু চুপ করে হেসে বলে— আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয়, আরও বহুতর গুরুদক্ষিণার উপাখ্যান পুরাণে উল্লিখিত হয়নি। আমি যদি ডাক্তার না হ'তাম হেডমাষ্টার— তবে এগুলো নিয়ে রিসার্চ করতে পারতাম।

ব্যাপারটা চরমে উঠল—একটা অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে। গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী তরুণ অনেক জল্পনা কল্পনা করে একটি সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করলে। দরিদ্র গৃহস্থকে সাহায্য, অনাথ-আতুরের সেবা করবে তারা। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে একটি করে ভাঁড় দিয়ে বলে গেল, দৈনন্দিন গৃহস্থের খোরাকীর চাল হতে এক মুঠো করে এই ভাঁড়ে তুলে রাখবেন। সাতদিনের সাত মুঠো চাল, রবিবারে এসে নিয়ে যায়। এ ছাড়া অবশ্য ভদ্রলোকেদের ব্যবসায়ীদের কাছে মাসিক চাঁদাও তারা পাবে।

তারা ডাক্তারকে এসে বললে—আপনার কাছে টাকা সাহায্য আমরা নেব না। আপনাকে আমাদের ডাক্তার হিসেবে সাহায্য করতে হবে।

ডাক্তার প্রায় ক্ষেপে গেল। সোজা বলে দিলে—থিয়েটার কর তো চাঁদা দেব। মদ খাও, গাঁজা খাও, তাতে কোনদিন পয়সার অভাব হয়, আমার কাছে এসো। কিন্তু এ সব চলবে না।

তারা অবাক হয়ে গেল।

ডাক্তার বললে—যাও যাও। clear out, clear out!

একজন রুখে উঠল—কি বলেন আপনি?

ডাক্তার বললে—আমি বলছি গেট আউট! চলে যাও এখান থেকে।

গোটা গ্রাম জুড়ে এবার ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন উঠল।

জনকতক ছেলে ডাক্তারকে অন্ধকারে প্রহার দেবার জন্তে ষড়যন্ত্র করলে। জনকতক তাকে বয়কট করবার চেষ্টা করতে লাগল —অন্য ডাক্তার আনবার জন্য।

ডাক্তার কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। দাওয়ার উপরে চেয়ার খানিতে বসে পা দোলাতে লাগল। প্রধান মশায় কিছু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অদ্ভুত মানুষ! লোকের অনুরাগে বিরাগে সমান নিস্পৃহ। নিঃসন্দেহে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। লোকটি গ্রামের লোকের প্রীতি অনুরাগ সব কিছুকে কর্কশভাবে উপেক্ষা ক'রে, অপমানিত ক'রে, তারই ঘরে রয়েছে—এতে তার মন খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে পারছিল না। কিন্তু উপায় নেই, ডাক্তার পুরো বছরের ভাড়া দিয়ে রেখেছে। তা'ছাড়া—তার ব্যবহার রূঢ় কর্কশ যাই হোক, অন্যায্য কিছু নেই। সেই তিক্ত অথচ শঙ্কিত দৃষ্টিতেই নিজের গদিতে বসে আড়চোখে ডাক্তারের দিকে প্রায় চেয়ে দেখে।

ডাক্তার শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে চুরুট টানে।

হঠাৎ যেন ডাক্তার উদাসীন হয়ে গেল। এটা নজরে পড়ল সর্বাগ্রে প্রধানের। সে কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না। তারপরই লক্ষ্য করলেন হেডমাষ্টার। ডাক্তার যেন অতিরিক্ত মাত্রায় স্তব্ধ! তর্ক প্রসঙ্গে অত্যধিক উগ্র হয়ে ওঠার পর ডাক্তার অনেক সময় স্তব্ধ হয়ে থাকেন। হেডমাষ্টার লোকটীকে ভালবেসে ফেলেছেন। তিনি তখন বলেন—কি মশাই? এখনও আপনার রাগ গেল না?

ডাক্তার তাতেও উত্তর না দিলে হেসে মাষ্টার বলেন—অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না, আমিও চীৎকার করব না; রাগ যদি না মিটে থাকে তো আমাকে নয় দু'ঘা মেরেই রাগটা মিটিয়ে ফেলুন।

ডাক্তার তাতে হেসে ফেলে। কিন্তু এবারের স্তব্ধতার সেরকম

কোন কারণই নেই। তা ছাড়া এ স্তব্ধতার ধরণটাও অন্য রকমের। ডাক্তার শুধু স্তব্ধই নয়—অত্যন্ত অন্যমনস্ক। চুরুট খাওয়ার মাত্রাও বেড়ে গেছে। তর্কে পর্যন্ত রুচি নেই।

হঠাৎ উঠে ডাক্তার চলে যায়। খানিকটা গিয়ে বোধ হয় মনে পড়ে বিদায় সম্ভাষণের কথা। থমকে দাঁড়িয়ে বলে, গুড নাইট হেডমাষ্টার।

হেডমাষ্টার প্রশ্ন করেন নানাভাবে—কি হ'ল ডাক্তার?

চুরুট টানতে টানতে ডাক্তার বলে—নাথিং হেডমাষ্টার।

—বাড়ীর খবর ভাল তো?

—ভাল। হুঁ—ভাল! গুড নাইট হেডমাষ্টার। ডাক্তার উঠে পড়ে।

হেডমাষ্টার চিন্তিত হলেন। কয়েকদিনই ডাক্তার আসছেন না। নিজেই সেদিন গেলেন তিনি ডাক্তারের ওখানে। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'ল না। ডাক্তার বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রধান মশায় ছিলেন নিজের দোকানে। তিনি সসম্ভ্রমে মাষ্টারকে বসতে দিলেন—তাঁর দোকানে সবচেয়ে ভারী চেয়ারখানা। তামাক—তামাক ক'রে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মাষ্টার বললেন—থাক! ব্যস্ত হবেন না, প্রধান মশায়। আমি তো রয়েছি। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না ক'রে যাচ্ছি না। ধীরে সুস্থে আনুক না তামাক।

প্রধান বললেন—আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেল মাষ্টার মশায়। ডাক্তার হয় ক্ষেপে গেছে, নয় ছ' মাসের বেশী বাঁচবে না। হঠাৎ আর এক রকম হয়ে গেল।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ। গরীব-দুঃখীর কাছে ফিজ নেওয়া বন্ধ ক'রে

দিয়েছে, ওষুদও অনেককে বিনা পয়সায় দিচ্ছে। আবার কাউকে কাউকে পথ্যের জন্যে পয়সাও দিচ্ছে।

হেডমাষ্টার হাঁপ ছাড়লেন। বরাবরই তাঁর সন্দেহ ছিল। মনে হ'ত এ কঠোরতাটা তার অস্বাভাবিক, ধার করা, ছদ্মবেশের মত। যাক্, লোকটা তা' হ'লে স্বাভাবিক হয়েছে।

ডাক্তার ফিরল প্রায় রাত্রি নটার সময়। নিস্তব্ধ জনহীন পল্লীর পথ। ডাক্তার গান গাইতে-গাইতে আসছিল; অবশ্য মৃদুস্বরে গান। হেডমাষ্টারকে দেখে স্মিত-হাস্যে সে বললে—I am very glad—আই এ্যাম ভেরী গ্ল্যাড ডক্টর। সব শুনলাম।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললে– কি শুনলেন, হেড-মাষ্টার ?

হেসে হেডমাষ্টার বললেন—আপনার গান তো নিজের কানেই শুনলাম। তারপর শুনলাম আজকাল আপনার ছদ্মবেশ ফেলে দিয়েছেন। গরীব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় দেখছেন—ওষুধও দিচ্ছেন অনেককে বিনা পয়সায়; কাউকে-কাউকে পথ্যের পয়সাও দিচ্ছেন।—আমার সন্দেহ বরাবরই ছিল, ডাক্তার।

ডাক্তার একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—এক কালে, প্রথম যৌবনে মাষ্টারমশাই—আজ আর সে হেডমাষ্টার বললে না, বললে—মাষ্টারমশাই, আমি সেবাধর্মকে গ্রহণ করেছিলাম জীবনের ব্রত হিসেবে। বিবাহ করিনি। সংকল্প ছিল এমনি ভাবেই জীবন কাটিয়ে দেব। সে কি আনন্দ, সে কি তৃপ্তি! কিন্তু—ডাক্তার চুপ ক'রে গেল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডাক্তার বললে—কিন্তু উপকারের ঋণ বড় মারাত্মক ঋণ, মাষ্টার মশাই। আর মানুষ বড় ভাল—অত্যন্ত ভাল, এ ঋণ শোধ করতে তারা—। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বললে—জীবনও দিতে পারে

মানুষ। ডাক্তার আবার চুপ করে গেল! এবার বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তারপর বললে—গুড নাইট, হেডমাষ্টার!

পরের দিন হেডমাষ্টার প্রত্যাশা করেছিলেন—ডাক্তার আজ আসবে কিন্তু ডাক্তার এল না। তার পরের দিন সকালেই প্রধান এসে সংবাদ দিলে—ডাক্তার চলে গেছে কাল রাত্রে।

চলে গেছে! হেডমাষ্টার চমকে উঠলেন। চলে গেছে? ব্যাপার কি?

ঘাড় নেড়ে প্রধান বললে, জানি না। যাবার সময় শুধু বলে গেল—তক্তপোষ চেয়ার এগুলি আপনি নেবেন, প্রধান মশায়। ওষুদ পত্রগুলো সদর শহরের ডাক্তারখানায় দিলাম। চিঠি লিখে দিলাম একটা—তাদের লোক এলে দিয়ে দেবেন। শেষ কথা বললে—দয়া ধর্ম একবার যখন করেছি তখন আর এর জের মিটবে না। এ আর বন্ধ হবে না। সুতরাং এখানে আর থাকা চলবে না।

হেডমাষ্টার স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

দীর্ঘকাল পরে হেডমাষ্টার একখানা চিঠি পেলেন। ডাক্তার লিখেছে। মৃত্যু-শয্যায় লেখা চিঠি—ডাক্তারের মৃত্যুর পর একজন উকীল চিঠিখানা রেজেস্ট্রী করে পাঠিয়েছে ডাক্তারের অভিপ্রায় অনুযায়ী। বৃদ্ধ হেডমাষ্টার পুরু চশমাটা চোখে দিয়ে চিঠিখানা পড়ে গেলেন। সুদীর্ঘ চিঠি। লিখেছে—

মাষ্টার মশাই,

যে কথা আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিনে শেষ করে বলে আসতে পারিনি, আজ সেই কথা সম্পূর্ণ অকপট চিত্তে জানালাম সুসমাপ্ত ক'রে। কথাটা—মানুষের পুণ্যের আমার পাপের। মনে আছে আপনাকে বলেছিলাম—উপকারের ঋণ মারাত্মক ঋণ, আর মানুষ বড় ভাল—এ ঋণ শোধ করতে জীবন পর্যন্ত দিতে পারে।—এক বিন্দু অতিরঞ্জন করিনি।

মাষ্টার মশাই, আমার তখন তরুণ বয়স, অফুরন্ত উদ্যম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দীন দুঃখী অনাথ আতুরের সেবা করে বেড়াতাম। মানুষের দুঃখে সত্যিই বুক ফেটে যেত। চোখে জল আসত। বিশ্বাস করুন—একবিন্দু কপটতা ছিল না। প্রবলের অত্যাচার, জমিদারের জুলুম, পুলিশের অন্যায় শাসন, মহাজনের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতাম তাদের। ভয় কাউকে করতাম না। তাদের স্নেহ করতাম সর্বান্তঃকরণে। মানুষেরও কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না, অকপট—অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা। দেবতার মত ভক্তি করত, আমার পায়ে কাঁটা ফুটলে তারা দাঁত দিয়ে তুলে দিত। ছেলেরা অসঙ্কোচে পরমাত্মীয়ের মত আমার কাছে এসে দাঁড়াত। যুবকেরা ক্রীতদাসের আনুগত্য নিয়ে আমার মুখের কথার অপেক্ষা করত। বৃদ্ধেরা এসে বসত, বলত, আমার পায়ের ধুলো পেলে তাদের সর্ব পাপ মোচন হবে, পরলোকে সদ্গতি হবে। পথ দিয়ে চলে যেতাম—কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা, কন্যা, বধূ-মাতারা শ্রদ্ধা-দীপ্ত অসঙ্কোচ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকত। আমার মনে হ'ত মাষ্টার মশাই—সত্যিই আমি নেমে এসেছি দেবলোক থেকে, তরুণ দেবতা আমি।

তারা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় আমার কাছে নৈবেদ্যের মত নিয়ে আসত তাদের দৈনন্দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ আহরণগুলি। ফুল-ফল, দুধ-মাছ। মাষ্টার মশাই, শ্রেষ্ঠ বস্তু এনে তারা আমার দরজায় দাঁড়াত—দেবমন্দিরে যেমন ভাবে তারা দিয়ে আসে তাদের সর্ববস্তুর অগ্রভাগ।

মাষ্টার মশাই, হঠাৎ সব বিষিয়ে উঠল। অনিবার্য পরিণতিই বলব একে। জীবন সমুদ্র মন্থন করতে গেলে বিষ উঠবেই। আমার ছিল না নীলকণ্ঠের শক্তি। মাষ্টার মশাই, এ ভাবে অমৃতের লোভে জীবন সমুদ্র মন্থন করবার অধিকারী আমি

ছিলাম না। যাক—যা ঘটেছিল তাই জানাই। সেবার রথযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীদল গিয়েছিল শ্রীক্ষেত্র। তারা এল কলেরা নিয়ে। একটি দরিদ্র পরিবার ছিল দলের মধ্যে। প্রৌঢ় বাপ, প্রৌঢ়া মা আর বিধবা যুবতী কন্যা। বাপ পথে মারা গিয়েছিল, কন্যাটির রোগ সবে দেখা দিয়েছে—এমন সময় এসে পৌঁছুল তারা গ্রামে। কন্যাটি যায় যায়—মা আক্রান্ত হ'ল। ছুটি রোগীর মাঝখানে বসে রাত কাটালাম আমি। এতটুকু ত্রুটি করলাম না। পরিশ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হল না, মা-টি মারা গেল। মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এল কন্যাটি। অনাথা মেয়েটি রোগমুক্ত হয়ে নিরুপায় হয়ে চলে গেল তার মামার বাড়ী। মাস কয়েক পরে একদিন পথে যেতে হঠাৎ দেখা হল মেয়েটির সঙ্গে। স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, বৈধব্যের নিরাভরণতার মধ্যে তার সকরুণ মূর্তিখানি বড় ভাল লাগল আমার। বললাম—এই যে, চমৎকার শরীর সেরেছে তোমার। বাঃ, ভারী আনন্দ হল। ভারী ভাল লাগছে তোমাকে দেখে।

পরদিন সে এল কয়েকটা গাছের ফল নিয়ে।

ছুদিন পর সে আবার এল—তার নিজের হাতের তৈরী মিষ্টান্ন নিয়ে।

আবার একদিন সে এল কিছু ফুল নিয়ে। কয়েকটি ছুর্লভ ফুল—সে ফুলের গাছ ওদের বাড়ীতে ছিল। আমি অন্য কোথাও দেখিনি। মাষ্টার মশাই, ওই ফুলের রূপ এবং গন্ধের মধ্যেই ছিল বিষ।

মন আমার বিষিয়ে উঠল। তার মনে কি ছিল জানি না। কিন্তু আমার মনে কামনার হলাহল যেন উথলে উঠল। সেই দিন রাত্রেই আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তার জানালার নীচে। মৃতুস্বরে ডাকলাম। জানালা খুলে আমায় দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

মাষ্টার মশাই, সে প্রথমটা শিউরে উঠেছিল আমার প্রস্তাবে। কিন্তু আমার মধ্যে তখন প্রবৃত্তির আলোড়ন জেগে উঠেছে কালবৈশাখীর ঝড়ের মত। বললাম—এই তোমার কৃতজ্ঞতা! সে খাতকের মতই দীন ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে আমার বুভুক্ষিত প্রবৃত্তির কাছে। সেই যে জাগল ক্রুর প্রবৃত্তি তার নিবৃত্তি আর হল না। শুধু তার আহুতি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারলাম না। মানুষের সকৃতজ্ঞ চিত্তের আনুগত্যের সুযোগে বহু-ভোগের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। আমার কর্মের খণ্ড থেকে এই মানুষগুলি তাদের কৃতজ্ঞতার পরিকল্পনায় গড়ে তুলেছিল যে দেবমূর্তি, আমার আত্মপ্রসাদের পূজায় সে দেবতা জাগল ক্ষুধা নিয়ে। মাষ্টার মশাই, শয়তান ক্ষুধার্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করলে মানুষ তার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পায়; মানুষ বহুক্ষেত্রে তাকে বধ করেছে, বহু দৃষ্টান্তই তার আছে। কিন্তু দেবতার ক্ষুধার্ত আক্রমণের মুখে মানুষ একেবারে অসহায়। সেখানে তার কোনক্রমেই নিস্তার নেই। আমার ক্ষুধার্ত দেবরূপ অবাধ গতিতে আদায় আরম্ভ করলে তার নৈবেদ্য, তার বলি!

আজ হয়তো আপনি মাষ্টারী করেন না; যদি করেন—তবে অনুরোধ রইল, ছেলেদের দেবতা হবার উপদেশ দেবেন না। মানুষ—শুধু মানুষ হতে উপদেশ দেবেন। দেবতাকে পূজা করতেও উপদেশ দেবেন না। তার সঙ্গে লড়াই করবার মত সাহস দেবেন তাদের। তারা যেন—যাক এসব কথা।

এরপর প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে চাইলাম; রাত্রির পর রাত্রি কাঁদলাম, উপবাস করলাম, তবুও—তবুও সংযত হল না প্রবৃত্তি। অনুশোচনারও অন্ত ছিল না। একদা মনকে স্থির করে সেবাব্রত ত্যাগ করে দেশে ফিরে এসে বিবাহ করলাম। আমার স্ত্রী সুন্দরী, গুণবতী, কিন্তু আশ্চর্য মাষ্টার মশাই—তাকে

ভালবাসতে পারলাম না। আমি জানি তাকে আমি ভালবাসিনি। তাই তাদের কাছেও থাকতে পারি নি। প্র্যাকটিসের অজুহাতে একখান থেকে অন্যখানে ঘুরেছি। জীবনে রূঢ় হতে চেয়েছি, মানুষকে দূরে রাখতে চেয়েছি। কটু বলেছি নিষ্ঠুরের মত, অর্থ আদায় করে পিশাচ হতে চেয়েছি—মানুষের কৃতজ্ঞতার ভয়ে। ক্রমে বহু পরিবর্তন হয়ে গেল জীবনে; আমার ভাষা ছিল মিষ্ট—হলাম রুক্ষভাষী, কথায় কথায় রাগ হতে আরম্ভ হল, তর্ক করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল—কিন্তু আসল পরিবর্তন হল না; সাপের বিষের থলি শূন্য করে দিলেও আবার সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; দংশনের প্রবৃত্তিও তার যায় না মাষ্টার মশাই। বারবার ঠকলাম। একবার কাউকে কৃতজ্ঞ হবার সুযোগ দিলে রক্ষা থাকত না। আমার অন্তরের সরীসৃপ জেগে উঠত। সেই সুযোগে সে প্রবেশ করতে চাইত তার ঘরে। তাই প্রাণপণে সংসারটাকে নিছক দেনা পাওনার হিসেবের খতিয়ানের খাতায় পরিণত করতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। হঠাৎ একদা আর আত্মসম্বরণ করতে পারতাম না। সেদিন সত্যই সৎপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই করুণায়, কর্তব্যের প্রেরণাতেই মানুষের দুঃখের ভাগ নিতাম। তারপর আর রক্ষা থাকত না। আরম্ভ হয়ে যেত আমার জীবনের জটিল খেলার নূতন দান।

আপনাদের ওখানে হঠাৎ একদিন কল থেকে ফিরবার পথে দেখলাম—একটি দরিদ্র তাঁতীর ঘরে একটি ছোট ছেলের তড়কা হয়েছে। প্রায় শেষ অবস্থা। কান্নাকাটি পড়ে গেছে। আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। অযাচিত ভাবে গিয়ে শিশুটির আসন্ন বিপদ কাটিয়ে দিলাম। মন ভরে উঠল প্রসন্নতায়। সেদিন আপনি আমায় গান গাইতে শুনেছিলেন। আপনি বলার পূর্ব পর্যন্ত নিজে গান গেয়েও আমার সে সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল না। আমি সেদিন

গাইছিলাম—'বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল আমার মনে'। সেদিন হঠাৎ আপনার কথায় চেতনা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেয়েছিলাম আমার ভবিষ্যৎ। ছেলেটির মাকে মনে পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। মনে পড়ে গিয়েছিল আসন্ন বিপদ আশঙ্কায় বিহ্বল মায়ের অসম্বৃত বেশবাসের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিতে পড়া তার দেহের কথা।

মাষ্টার মশাই, সমস্ত রাত্রি সমস্ত দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতেছিলাম। অজগরকে ঝাঁপিতে পুরে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

মৃত্যুর পরপার যদি থাকে—তবে সেখানে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে আপনি আমার সম্বন্ধে কি বলেন শুনবার প্রতীক্ষা করব। বলবেন।

মাষ্টার মশাই দুটি হাত তুলে আপন মনে বললেন—নমস্কার।

॥ কুশ-পুত্তলী ॥

শান্ত পল্লীটির সকল শান্ত মাধুর্যটুকু যেন পুঞ্জীভূত হইয়া বাসা বাঁধিয়াছিল ওই নিরঞ্জন ছেলেটির বুকে।

লোকে তাই বলিত।

ব্রাহ্মণের ছেলে। লোকে বলিত,—'হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ বটে; পড়া আর পূজা লইয়াই দিন কাটিয়া যায়।'

কিন্তু মেয়েরা বলিত,—'কি রকম মেয়ের মত লাজুক! সাত চড়ে মুখে রা নাই,—মুখ তুলে কথা কইতে পারে না, ওই কি ব্যাটা ছেলে না কি?'

পুরুষে বলিত,—'হুঁ, মেয়ের বুদ্ধি কি না, আরে ও দার্শনিক যে, চুপ করে থাকা ওদের একটা বড় লক্ষণ।'

মেয়েরা বলিত,—'হ্যাঁ, ওই আবার লক্ষণ, ও অলক্ষণ। বাঁচাল মেয়ে আর বোবা পুরুষ বিধেতার অলক্ষুণে ছিষ্টি।'

সত্যই বাল্যকাল হইতে বাক্‌দেবীর একনিষ্ঠ আরাধনায় ডুবিয়া থাকিয়া সমাজে সে নির্বাক হইয়া পড়িয়াছিল। সে সকলের সঙ্গ এড়াইয়া চলিতে চাহিত, বিশেষতঃ মেয়েদের; তাহাদের সম্মুখে চোখ তুলিতেই তাহার অন্তর কেমন যেন বলিয়া উঠিত,—'ধ্যেৎ!'

ও-বাড়ীর বৌদিদি বলিতেন,—'দেখব হে দেখব, আমাদের কাছে লজ্জা, আবার বৌ এলে তখন দেখব; বলে লাজ ত লাজ,—বলে যে সেই—

লাজের মাথা চিবিয়ে খাবে মুখে তখন ফুট্‌বে খৈ।
রাঙা চরণ ধরে বলবে—জানিনা আর তোমা বৈ॥'

নিরঞ্জনের ইচ্ছা করে পলাইয়া যায়, কিন্তু পারে না। প্রসঙ্গটা পাল্টাইতে গভীর মনোনিবেশ সহকারে দর্শনের পাতা উল্টাইয়া যায়।

তাহার এই বিব্রত ভাবে বৌদিদি জয়োল্লাসেই বুঝি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

নিরঞ্জন সহসা বলিয়া উঠে,—'জান বৌদি, দর্শনের এই খানটা বড় কঠিন—'

বৌদিদি পরম গম্ভীর ভাবে বলে,—'বেজায় কঠিন, জানি যে ঠাকুরপো, ও কঠিন ঠেকবেই। অদর্শনের মাঝে কি দর্শনের মীমাংসা হয়? আমি আসবার আগে তোমার দাদারও ঠিক অমনি কঠিন ঠেকত।'

নিরঞ্জন কথার মানেটা বোঝে কিন্তু গন্ধটা ঠাওর পায় না; ছোট ছেলেরা যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদটা বোঝে কিন্তু মিষ্টি বেশী কি নুন বেশী বোঝে না। তবু সে বলিয়া যায়, উৎসাহ ভরেই বলিয়া যায়,—'তুমি বুঝি দর্শন পড়েছ বৌদি? যে বড় পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে তুমি! এই যে শ্লোকটা, বুঝেছ বৌদি, এই···'

বৌদিদি আর থাকিতে পারে না, হাসিয়া উঠিয়া বলে,—'রক্ষে কর, আর শ্লোক আউড়ে যেয়ো না; তার চেয়ে কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়াও—।'

নিরঞ্জন কিছু বুঝিতে পারে না, তবু কথাটার ঘায়ে অপ্রস্তুত হইয়া বলে,—'না—না, বড় কঠিন কিনা—'

বৌদিদি বলে,—'হ্যাঁ গো, তাই ত বল্লাম, প্রাণেশ্বরীর অদর্শনের মাঝে ও দর্শনের অর্থ বোঝা যায় না; নতুন বৌকে আন, সে সব বুঝিয়ে দেবে।' বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়।

পশ্চাতে নিরঞ্জন বলে,—'ধ্যেৎ!'

তবু নিরঞ্জন মরা মানুষ ছিল না। তাহার সাধ ছিল, হৃদয় ছিল,

রসিকতা করিতে ইচ্ছাও হইত। সন্ধ্যায় ফোটা রজনীগন্ধা তুলিয়া সন্ধ্যার ধূসর আবরণে আপনাকে লুকাইয়া ফুলটি কানে পরিত। দরিদ্রের দুঃখে বুক তাহার টন্ টন্ করিত; মাঠে একা বেড়াইতে বেড়াইতে বৃক্ষতলে হনুমান দেখিয়া তাহার সহিত রসিকতা করিয়া হিন্দী বাত ঝাড়িয়া দিত—'ওহো, কেয়া করতা মিঞা? বট পেঁড়কে ছায়ামে প্রিয়াকো ভাবতা হ্যায়—? না কেয়া?'

হনুমান নড়ে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। নিরঞ্জন বলে—'ঠিক, ঠিক, তুম বিরহী হ্যায়, হামারা মাফিক। প্রিয়া কাঁহা গিয়া ভাই, বাপকা বাড়ী?' বলিয়া ঢেলা হাতে খানিকটা আগাইয়া যায়; হনুমান দাঁত খিচাইয়া উঠিলে পিছু হটিতে হটিতে কৌতুক ভরে কহে—'ও—হো—হো—হো—।'

গরীবের মেয়ে কিশোরী বধূটি, নামও কিশোরী, সবে মাত্র কৈশোরের ঘুম টুটিয়াছে, যৌবনের মর্মলোকবাসিনী রাজকন্যাটি সদ্য তখন জাগিয়াছে; কল্পলোকের কন্যা সে, সাধ তার অনন্ত, কামনা তার অফুরন্ত।

এই সদ্য জাগরণের মুহূর্তটিতে তার ডাক পড়িল স্বামীর ঘরে। মা, বাপ মাস খানেকের আড়াআড়ি দুজনেই মারা যাওয়াতে গৃহস্থালী নিরঞ্জনের পক্ষে বনস্থলী হইয়া উঠিল। দেবতার নিবিড় ধ্যানের মাঝেই নৈবেদ্যের থালা সাজাইবার চিন্তা আসিয়া জুটে; অধ্যয়নের অখণ্ড মনোযোগের মাঝে তৈলহীন দীপ-শিখা ম্লান হইয়া যায়। মুক্তি ও বন্ধনের মীমাংসার মাঝে রন্ধনের চিন্তা করিতে হয়; তখন এই বনের মাঝে নিরঞ্জনের বধূকে মনে পড়িল। একটা দারুণ সমস্যার মীমাংসা করিয়া নিরঞ্জন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু বধূকে আনিবার প্রস্তাব করিবার উপায় সে খুঁজিয়া পায় না,—লজ্জাতে মন যেন ছি-ছি করিয়া উঠে। কিন্তু গরজ

না কি বড়ই বালাই, গরজের ঠেলায় সরমের মাথা খাইয়া একখানা চিঠি লিখিয়া গাড়ী পাঠাইয়া দিল। শ্বশুরকে লিখিল—'আমার সংসার চলে না, তাই আপনার কন্যাকে আনিতে গাড়ী পাঠাইলাম। দিনের বিচার করিলে আমার উপর অবিচার করা হইবে, সুতরাং কল্যই তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন।'

কিশোরীও আসিল।

গাড়ীর মুখ হইতেই নিরঞ্জন বলিতে সুরু করিয়াছিল—'এইটা ভাঁড়ার ঘরের চাবী, রান্নাঘর খোলাই আছে, লক্ষ্মীর ঘরের চাবী ঐ লম্বাটা ;—দেবতাদের আতপের ভোগ হয়, সে ত তুমি জানই ; —আর......'

আর বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না। বিব্রত হইয়া কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিবার ভাণে বধূটির দৃষ্টি হইতে নিজেকে আড়াল করিতে চাহিল ; ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, সাগ্রহে অহেতুকী উচ্চ কণ্ঠে সহসা বলিয়া উঠিল—'আর আমার পড়ার ঘরের পিদীমটা, ওটা একবার মেজে দিয়ো, আর তেল বেশী করে দিয়ো, আর—আর—' এবার কিন্তু কিছুতেই আর কিছু মনে পড়িল না। বাক্যহীন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা—সেও কেমন-কেমন ঠেকিল ; অগত্যা মাঝ অঙ্গনে বধূটিকে একা দাঁড় করাইয়া দিয়া নিরঞ্জন সহসা ত্বরিত পদে পাঠগৃহে প্রবেশ করাই নিরাপদ বিবেচনা করিল। কিশোরীও বাঁচিল। তরুণীটির কৌতুক-চপল বুকখানি পুরুষটির এই সলজ্জ বচন-বিন্যাস ও পলায়ন-ভঙ্গীতে হাসির উচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে হাসিয়া বাঁচিল। হাসির গুঞ্জন কানে পশিতেই লজ্জার উপর লজ্জায় নিরঞ্জন নিরালার মাঝেও বিব্রত হইয়া উঠিল ; সহসা সে উচ্চকণ্ঠে পাঠ সুরু করিয়া দিল, বই খুলিয়া নয়, কড়িকাঠের পানে চাহিয়া—সকৃদগতি যুগপদ্ভাবি গতি...।

পড়ার গতিটা ওই গতি পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেল। ওদিকে তরুণীকণ্ঠের হাসির অস্পষ্ট গুঞ্জন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে! নিরঞ্জন ঘামিয়া সারা হইয়া উঠিল।

কৌতুক-তরলা পল্লীবালা হাসিল, কিন্তু মর্মলোকবাসিনী রাজকন্যা মুখভার করিল, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'এই কি সম্ভাষণ—!'

দ্বিতীয় সম্ভাষণ হইল, তখন কর্মকুশলা গরীবের মেয়ে গৃহস্থালীর মাঝে আপন আসন পাতিয়া লইয়াছে, ঘরের তালা খোলা গিয়াছে, সুনিপুণ মার্জনায় গৃহের আবর্জনা ঘুচিয়াছে; মোট কথা গৃহশ্রীর আবির্ভাবে গৃহের শ্রী তখন পরিপূর্ণ ঝল-মল করিতেছে, আর কল্যাণী শ্রীরূপিণী বধূটি রন্ধন সারিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে; নিরঞ্জন আসিয়া কহিল,—'দু-দুটি লোক আছে, —দু'দিন খায় নাই; তা···তা···আমার···আমার ভাত ওদের দিলে হয় না ·!'

বধূটীর মুখখানি সপ্রশংস পুলকের দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়া আবার তখনি ম্লান হইয়া গেল। অন্তরবাসিনী কহিল,—'আমার! কই আমাদের তো বলিল না!'

ক্ষুণ্ন মন খুঁতই ধরিতে চায় যে।

কিন্তু বুকের ব্যথা মুখে ফোটে না; সরমে, অভিমানে বাধে—; শুধু একটির পর একটি জমাট বাঁধিয়া তিলে তিলে তাল প্রমাণ হইতে চলে।

কিশোরী নিঃশব্দে উঠিয়া দুখানা পাতা আনিয়া উঠানে পাতিয়া দিয়া রান্না ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল। ভাত লইয়া আসিয়া দেখে দুইটা মস্ত জোয়ান, মাংসহীন শীর্ণ দেহ, যেন বৈশাখের আগুনে পোড়া পত্র-পল্লবহীন নেড়া তালগাছ দুইটা।

গৃহস্থের মেয়ে সকল কাঁটার ব্যথা ভুলিয়া গিয়া মনের সাধে

লোক দুইটীকে খাওয়াইল। লোক দুইটী বিপুল ক্ষুধায় বড় বড় গ্রাসে লোলুপ চক্ষে ভাতের কাঁড়ি হাঁ হাঁ করিয়া গিলিয়া যায়,—কিশোরীর মনে হয় এ যেন সেই কাম্যক বনে গোবিন্দকে দ্রৌপদীর শাকের কণা খাওয়ানো, দীর্ঘ জীবনব্যাপী অনন্ত ক্ষুধার মাঝে আজ এটুকু শাকের কণা বৈ আর কি?

লোক দুইটী আহারান্তে পরম তৃপ্তিতে গোবিন্দের মত ঢেকুর তোলে। কিশোরীর মনে হয়, বিশ্বের উদর বুঝি পূর্ণ হইয়া গেল আজ,—অন্ততঃ তাহার উদর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আঃ—

নিরঞ্জন লোক দুইটীকে বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়া দেখিল, বধূটি তখন পরিপাটী করিয়া আসন বিছাইয়া জায়গা করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া পাখা-হাতে বসিয়া। অতিথি-সৎকার-তৃপ্তা গৃহিণী বধূটির মুখ আনন্দে ঝলমল করিতেছিল। এই সুখটুকুতে বুকে তখন আর কাঁটার ঘায়ের ব্যথা ছিল না। আনন্দের আতিশয্যে তরুণী গৃহিণীটী নিজেই কহিল,—'খেতে বস।'

নিরঞ্জন সবিস্ময়ে কহিল,—'আমার ভাত তো···; তা—তা··· তোমার ভাত···।'

সঙ্কোচ দেখিয়া আবার আনন্দোচ্ছলা বধূটি কৌতুকে ডগমগ হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া পাকা গিন্নীর মতই কহিল,—'আমার আছে, তুমি খাও—বস।'

বধূটির কণ্ঠে কথায় নিরঞ্জন কেমন হইয়া গেল। সে আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া একটা-কিছু বলিবার কথা মনে মনে খুঁজিতে লাগিল। সহসা সে পরম গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল,—'তা—তা হলে চাল বেশী নেওয়া হয়েছিল, ভাত নষ্ট হতো···। অপচয় ভাল নয়, তা আমিই না হয় চাল দেখে দোব—'

সে মনে করিল, কিশোরীকে কর্মে সাহায্য করিবার একটা সুযোগ পাইল।

কিন্তু কিশোরীর বুকে কথাটা তীরের মত গিয়া বিঁধিল। রান্না করিয়া তাহাকে আবার পথে বসাইলে সে আঘাত অসহ্যই হয়; বধূটির মনে হইল, এ তাহার গৃহিণীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইল, একরূপ কাড়িয়া লওয়াই হইল; এক মুহূর্তে সকল আনন্দ বিপুল বেদনাচ্ছন্ন ম্লান হইয়া গেল।

সত্যই সে চাল লইয়াছিল বেশী, দুইজনের খাদ্যের পরিমাণের চেয়ে বেশী; তাহার কারণও ছিল। বধূটির সঙ্গে একজন লোকও আসিয়াছিল যে। কিন্তু কথাটা বলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। শুধু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—'বেশ।'

বাপের বাড়ীর লোকটাকে মুড়ি দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া কিশোরী অনাহারেই রহিয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল নিরঞ্জনকে খাওয়াইয়া আবার রাঁধিবে, কিন্তু আর সে প্রবৃত্তি তাহার হইল না; ছিঃ, ভাতের খোঁটা, পেটের কেলেঙ্কারী, ছিঃ—

কিন্তু কথাটা আসলে হইতেছে অভিমান; প্রিয়জনের পরে অভিমানে মানুষ আত্ম-নির্যাতনই করিতে চায়। তাহার গোপন অর্থ হইতেছে, যাহার উপর অভিমান, আপনাকে নির্যাতিত করিয়া তাহাকে নির্যাতন করা।

কিন্তু হায়, সে জন সেদিকে তাকাইলে তো! সারাটা দিন নিরঞ্জনের বাহিরে বাহিরে আড়ে আড়ে ফিরিয়া কাটিয়া গেল, তাহার মাঝে পরের খোঁজও করিল কিন্তু ঘরের মাঝে অভিমান-হতা বধূটির খোঁজ করা হইয়া উঠিল না। কথাটা বুকের মাঝে উঠিলেও মুখে ফুটিতে পারিল না। অনুভূতির মাঝে এই কথাটাই গুপ্ত ভাবে ছিল,—আত্মীয়ের সঙ্গে কুটুম্বিতা, ছিঃ; আর—আরও একটা বড় ছিঃ—সেটা সঙ্কোচের, সরমের। চোখে চোখ মিলিতেই যে কেমন দেহে মনে ফুটিয়া উঠে ওই—ছিঃ। রাত্রিতে এই সরম চরম হইয়া উঠে, মরমের পরম তৃষ্ণা দর্শনের পৃষ্ঠার অন্তরালে

কাঁদিয়া মরে, একটি কোমল লাবণ্যভরা সুকুমার তরুণ তনুর স্পর্শনের তরে লালায়িত-মনকে দর্শনের সমস্যার মাঝে জোর করিয়া ডুবাইয়া রাখিতে হয়।

আর নববধূটির অন্তরে রাজকন্যা ভাবে এ অবহেলা, অভিমানের উপর অভিমানে বুক ঠেলিয়া কান্না আসে। কিন্তু অভিমান যে সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে চায় না। সে জোর করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়, কতক্ষণ অনিদ্রার পরে তন্দ্রা আসে, কত সুখ-স্বপ্নের মাঝে রজনী কাটিয়া যায়। একটা নাড়াচাড়ায় ঘুম ভাঙিতেই নিরঞ্জনের সাথে চোখো চোখি হইয়া গেল,—নিরঞ্জন তখন অতি সন্তর্পণে বিছানা হইতে উঠিয়া যাইতেছিল। চোখে চোখ মিলিতেই সে ছি—ছি-কারের ধিক্কারে যেন মরমে মরিয়া গেল। ভাবটা কাটাইতে সে জোর করিয়া হাসিয়া কহিল—'ব—বড় ঘেঁষা-ঘেঁষি হয়, বিছানাটা এঁ্যা—বলছিলাম কি, ব—বড় করে করো। উঃ—কি গরম!' বলিয়া কোঁচার খুঁট নাড়িয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিল।

রাজকন্যার মনে হইল—'আমার স্পর্শও অসহ্য!' একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বধূটি কহিল—'বেশ।'

রাত্রে নিরঞ্জন দেখিল, দুটি বিছানা, মাঝের ব্যবধান অতি-সাবধানতার দূরত্বকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। নিরঞ্জনের মন সায় ত দিলই না,—হায়, হায় করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিল একটা টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু পারিল না, মনে জাগিল, ছিঃ—।

অন্ধকারের মধ্যে বধূটি অঙ্গে করস্পর্শ অনুভব করিল। অভিমান দ্বিগুণ হইয়া উঠিল, সে গড়াইয়া বিছানার ওপাশে মাটিতে গিয়া শুইল। রুদ্ধ রোদন আর বাঁধ মানিল না, বধূটি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এপাশের ব্যক্তিটি হাত গুটাইয়া লইল। সরমের ছি-ছি-কারে মরমে মরিয়া গেল, তাহার উপর ক্রন্দনের শব্দে দিশাহারা হইয়া বালিশের মাঝে মুখ গুঁজিয়া কাঠের মত পড়িয়া রহিল—যেন অপরাধের তাহার আর অন্ত নাই!

এমনি করিয়া মিলনের মাঝে অমিলনে দিন যায়, ঘরের মাঝে দূরে দূরেই পরস্পরের থাকে। দিনের পর দিন যায়, সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বের সীমা বাড়িয়া যায়।

দিনে দিনে মাস চলিয়া যায়।

বধূটির বুকের ভিতর রাজকন্যা অসহ যন্ত্রণায় পাগল হইয়া উঠে, ঘর-সংসার সবের উপরেই যেন বিরূপ হইয়া উঠে। তবু গৃহস্থের মেয়ে সকল ব্যথা বুকে বহিয়া মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যায়। পাড়ার মেয়েরা আসে, সমবয়সী বিধু ঠাকুর-ঝি, ও বাড়ীর যুঁই বৌ, বড় জা, বেলা বৌ, সে-ও সম্বন্ধে বড়,—কিশোরী সঙ্গ পাইয়া বাঁচিয়া যায়।

কত কথা হয়, গরমের দিন, বাতাস বহাইতে সাত কুঁদুলীর মাথা খায়—

'সাত কুঁদুলীর মাথা খেয়ে
বাতাস দেবে ফুরফুরিয়ে……।'

বেলা বৌ বলে,—'সাত কুঁদুলীর নাম কর।'

বিধু আঙুলের পাব গুণিয়া বলে,—'গোগাঁয়ের বৌ এক, দু-নম্বর জিতুর মা, শ্যামার পিসী তিন, ভাদু চার, পদি পাঁচ—'

যুঁই-বৌ পাদপূরণ করে,—'বিধু ঠাকুরঝি ছয়—'

বিধু বড় বৌকে একটা খোঁচা দিয়া বলে,—'মাঙ্গপিণ্ডি যুঁই বৌ সাত, এই সাত জনের মাথা খেয়ে বাতাস দেবে ফুরফুরিয়ে!'

তবুও বাতাস বয় না।

গরমে হাঁস-ফাঁস করিতে করিতে স্থূলাঙ্গী যুঁই বৌ মেঝের উপর পড়িয়া বলে,—'পবন ঠাকুর কি পিথিমী ঠাকরুণের ভাসুর হ'ল নাকি?'

চপলা বিধু বলে,—'কি শাস্তরজ্ঞান বৌর আমাদের, সাক্ষাৎ মহাভারত; চেহারাতেও তাই একেবারে অষ্টাদশ পর্ব—।'

তরুণে তারল্য স্বাভাবিক, তরুণী কয়টি হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

যুঁই বৌ বলে,—'মর চামড়ী, গরমের কথায় আমার গতর নিয়ে পড়লি ক্যানে?'

বিধু বলে,—'জান না, চামড়ীর রকমই যে ওই, কথায় বলে না—চামড়ী সর্বস্ব খায়, ধুমড়ীকে নিয়ে দরবারে যায়।'

কিশোরী একখানা পাখা আনিয়া বড় জাকে বাতাস করিতে করিতে বলে,—'বাতাস করব, দিদি?'

বড় বৌ গায়ের কাপড় বেশ করিয়া সরাইতে সরাইতে বলে,—'বেঁচে থাক্ বুন, পাকা চুলে সিঁদুর পর, রাজার মা হ—। আঃ।'

বিধু বলে,—'আমরা কিন্তু গাল দোব নোতুন বৌ, বলব, ওই যুঁই-বৌর মত ভুঁদ্‌সী মোটা হ—পানের চূণে গাল পুড়ে যাক্—তোকে বোল্‌তায় কাম্‌ড়ে দেক্—। নইলে আমাদেরও বাতাস কর বলছি, হ্যাঁ—।'

বেলা বৌ বলে,—'একেই বলে দারুণ ননদিনী,—ছাড়ালে না ছাড়ে যেন সেঁয়াকুলের কাঁটা; ভেজের হিংসেতেই পাট্‌-পাট্।'

বিধু বলে,—'কিন্তু মাইরী বলছি, বড়-বৌর গতরের হিংসে আমি করিনে; ও পাট-ভাণ্ডার হবার আমার সাধ নাই।'

বৌ কয়টি হাসিয়া উঠে।

বড় বৌ বলে,—'তবে কি আমার ভাতারের হিংসে করিস নাকি? দেখ, তা আমি দিতে পারি, সে ভাই সারা রাত আমায়

বাতাস করে, হাতের পাখা,—উঃ ছাড়—ছাড়, বিধে পোড়ারমুখী ছাড় বল্‌ছি।'

বিধু কথার মাঝখানে বড় বৌকে চিমটি কাটিয়া ধরিয়াছিল।

বিধু বলে,—'আর বলবি ?'

বড় বৌ বলে,—'আর বাতাস খাবি ?'

বিধু বলে,—'বাতাস খাব না ক্যানে—?'

বড় বৌ বলে,—'সেই জন্যেই তো পাখা করবার লোক দিতে চাইছি—।'

বিধু মুখ ঘুরাইয়া বলে,—'আমার লোকের অভাব নাই।'

কৌতুকের আবহাওয়ায় দুঃখের স্মৃতি ভুলিয়া কিশোরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে,—'কে সে লোকটি ঠাকুর-ঝি, ঠাকুর জামাই না কি ?'

বিধু একটা ঠোনা মারিয়া বলে,—'মর পোড়ামুখ, নিরুদাদা বুঝি তোকে বাতাস করে ?'

বাতাস করার কথায় সুপ্ত দুঃখের হুতাশ দ্বিগুণ হইয়া জাগে। মনে জাগে,—ভিন্ন শয্যা, শয্যার মাঝের ব্যবধান, ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, কথা—সব। প্রথম দিনের 'আমার ভাত' কথাটি পর্যন্ত।

সদ্য ফোটা ফুলটি আকস্মিক ঝড়ে যেন ছিন্নদল ম্লান হইয়া যায়।

বড় বৌ বলে,—'ভাল কথা, আচ্ছা ভাই নোতুন বৌ, নিরু ঠাকুরপোর সঙ্গে কেমন ভাব হল বল দেখি ?'

মান জিনিষটা নাকি প্রাণের চেয়েও বড়, লোকে প্রাণ দিয়াও অপমান ঢাকিতে চায়; কথায় আছে, অনাহারে থাকিয়াও কে নাকি ঠোঁটে রং মাখিয়া পান খাওয়ার ভাণ করিয়াছিল, ইজ্জতের এমনি দাম! কিশোরীর মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল—অপমানের আশঙ্কায়, তবু সে তাহারই মাঝে হাসিতে চাহিল।

শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মত ক্ষীণ ম্লান হাসিটুকু,—তবু যেন সে কেমন—ছন্দহীন, অস্বচ্ছন্দ।

কৌতুক-তরলা, সুখাবিষ্টা বিধু কহিল,—

'সে কথা আর মনে আমার পড়াস না লো সৈ।
শ শুনলে শ্যাম-সোহাগী বলবে লো শ্যাম কৈ!

দেখ্ না মুখখানা যেন হিঙুল-বরণ হয়ে উঠেছে।'

রঙ্গ ব্যঙ্গ হইয়া বুকে শেলের মত বাজে, বুকের ব্যথা বুকে আর ধরে না,— রোদনের উচ্ছ্বাসরূপে বাহিরে আসিতে চায়।

সহসা ও বাড়ীর রজন ঠাকুর-ঝি হাসিয়া গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া সত্যিই মেঝের উপর গড়াইয়া পড়ে।

বিধু বলে,—'মর্, মরণ হাসিতে পেলে না কি?'

রজন কয়,—'কেঁউদোর বৌ কাঁদছে।'

বড় বৌ বলে,—'তার আবার হাসি আছে নাকি?'

রজন কয়,—'আগে শোন্ না ফুটো ঢাক্,—মুখপুড়ীর বড়ি খেয়ে দিয়েছে হনুতে, তারই কান্না,—ডাক ছেড়ে, 'সোরমার' করে।'

কৌতুকে তরুণীর দল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বলে,—'চল—চল, দেখে আসি—'

স্থূলাঙ্গী যুঁই বৌ পিছনে পড়িয়া থাকে, সে হাঁকে—'দাঁড়ালো, দাঁড়া—'

বিধু বলে,—'শুয়ে পড়ে গড়িয়ে আয়, তবু শিগ্রি আসবি—।'

কিশোরী নির্জনতার সুযোগ পাইয়া কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল; কাঁদন আর বাধা মানিতেছিল না।

এমনি করিয়া সঙ্গিনীরা রসালাপে হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়, আর নির্জনে বধূটীর অশ্রু-প্রবাহে বুক ভাসিয়া যায়।

সেদিন কিশোরী কাঁদিতেছে, সহসা বিধু আসিয়া হাজির।

সবিস্ময়ে বিধু কহিল,—'বৌ, কাঁদছিস!'

কিশোরী শুধু অপ্রস্তুতই হইল না, রাগিলও। এমন করিয়া সময় নাই, অসময় নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, আসাটাই বা কি রকম! তাহার এই আরাধনার সময় আরাধিকা আর আরাধ্যের মাঝে তৃতীয় জনা আসে কেন? সে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল, কথা বলিবার কিছু পাইলও না, বলিলও না।

বিধু কহিল,—'নিরুদাদা বকেছে?'

কিশোরী ভ্রুভঙ্গী করিয়া কহিল,—'না বকবে কেন?'

বিধু কহিল, —'তবে?'

কিশোরী মুখ-ঝামটা দিয়া কহিল,—'তবে কি ঘরের কথা সব পরকে বলব নাকি ঠাকুর-ঝি, না তাই বলা যায়?'

বিধুও কম নয়, তাহার উপর সে গ্রামের মেয়ে; 'বলিয়ে কহিয়ে' হওয়ার গৌরবের অধিকারটা তাহাদের একচেটে। সেও মুখ ঘুরাইয়া ঠোঁটের আগায় একটা পিচ্ কাটিয়া কহিল,—'ও—মা—গ বলে—সেই 'মিন্সে নেয় না পায়ের কাছে, মাগী বলে আমার সোহাগ আছে!' জানি লো জানি, পেঁচো ঝি-এর কাছে সব শুনেছি......'

পেঁচো বাউরের মেয়ে, কিশোরীর এঁটো-কাঁটা মুক্ত করে, বাসী পাট্ সারে।

কিশোরী কহিল,—'বেশ ত ঠাকুর-ঝি, তোমার সোহাগ ত আমি কেড়ে নিতে যাই নি, তোমার এত রাগ কেন?'

বিধু কহিল,—'কাড়তে গেলেই পায় নাকি—'

কিশোরী কহিল,—'তেমনি তুমিও তো তোমার ভেয়ের আদর কেড়ে নিয়ে আমায় দিতে পারবে না, তখন তোমার দরদে আমার দরকার কি?'

বিধু কহিল,—'আমার দায়! বলে—রাধায় করতে শ্যাম-

সোহাগী, পায়ে শুধু বৃন্দে মাগী', তা আমার নেকনে ত আগুন ধরে নাই যে বৃন্দে দূতী হব!'

কিশোরী কহিল,—'আমারও নেকনে আমারও আগুন এখনও ধরে নাই—'

তাহার কথাটা কাড়িয়া বিধু ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—'আর ধরে কি করে লো, বলি আর ধরে কি করে? এমন হতচ্ছেদ্দার ভাতের মুখে ঝাঁটা, আর সে মেয়ের মুখেও ঝাঁটা। জানিস—'যাকে ভাতারে করে ছি,—তার জীবনে কাজ কি?' আমরা হলে গলায় দড়ি দিতাম, না জুটত, নদীতে জল আছে ডুবে মরতাম।' বলিয়া সে অঙ্গ দোলাইয়া যেন জয়পতাকা উড়াইয়া চলিয়া গেল।

কিশোরী নির্বাক নিঃস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল, চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া ঝরিতেছিল।

তারপর কল্পলোক-বাসিনী কন্যার কোন খেয়াল হইল কে জানে,—আয়না, চিরুণী, তেলের বাটী, সিঁদুর কৌটা লইয়া প্রসাধনে বসিল।

পেঁচো ঝি কহিল,—'রজন ঠাকরুণকে ডেকে দোব বৌঠাকরুণ, খুব ভাল খোঁপা বাঁধে......।'

কিশোরী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—'না, না, না—খবরদার, পেঁচো খবরদার, ভাল হবে না......'

পেঁচো কহিল,—'তা বারণ কর, ডাকব ক্যানে মা। ও-কি, ও কি—সিঁতেটা বেঁকে গেল যে গো!'

কিন্তু শত চেষ্টাতেও সে বাঁকা সিঁথি সোজা হইল না, কপালের সিঁদুরের টিপটা মোটা হইয়াই রহিয়া গেল।

পেঁচো কহিল,—'উ, ভাল হল না বৌঠাকরুণ, তা হবেই বা কি করে, যে হাত কাঁপচে তোমার!'

কিশোরী তাড়াতাড়ি সব গুটাইয়া কহিল,—'ওই বেশ হল, তু' থাম্ বাপু।'

পেঁচো কহিল,—'হ্যাঁ, ওই আবার বেশ হয়! বলে—খোঁপা বাঁধবে, দেখে বেটাছেলেদের চোক ফিরবে না। দেখতে, যদি রজন ঠাকরুণ বেশ চলকো করে চুল বেঁধে দিত, তো দাদাঠাকুরের ভজন-পোজন সব মাথায় চ'ড়ে যেত।' বলিয়া রসোল্লাসে সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

এবার আর কিশোরীর মুখে কিন্তু বাক ফুটিল না, সে যেন কত অপরাধী! সমস্ত দেহের আবরণ নগ্ন হইয়া যাওয়ার অপরাধের মত অপরিসীম লজ্জায় সে এতটুকু হইয়া গেল।

পেঁচো আবার কহিল,—'তা হোক, লাও, এইবার একখানা চলকো পাড় তক্‌তকে কাপড় পর দেখি। কথায় বলে—শঙ্খ, সাড়ী, কেশ—তিনে রাণীর বেশ।'

দিশেহারাকে যেদিক মানুষ ধবাইয়া দেয়, সেই দিকই সে ধরে; এত লজ্জার মাঝেও কিশোরী পেঁচোর কথাটা ঠেলিল না, পালন করিতেই ছুটিল।

পানের ডিবেটি হাতে লইয়া শয়ন গৃহের দুয়ারে আসিয়া কিশোরী দাঁড়াইল, পা যেন আর উঠে না!

বুকের মাঝে একটা অপরিসীম উদ্বেগ কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। বুকের অন্তঃস্থলের অসম্ভব দ্রুত স্পন্দনের শব্দ যেন বাহির হইতে শোনা যাইতেছিল—ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্। কিশোরীর মনে হইল,—সে যেন তাহার অন্তরাত্মাব ছি-ছি-কারের ধিক্কারে ধিক্, ধিক্, ধিক্!

তাহার ইচ্ছা হইল—চুল খুলিয়া, আট-পৌরে সাড়ীখানা পরিয়া আসে!

শেষে জোর করিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল।

নিরঞ্জন অদূরে প্রদীপের স্তিমিত আলোকে দর্শনের পাতায় নিবিষ্ট, পদশব্দে মাথাটা আরও যেন ঝুঁকিয়া পড়িল।

কিশোরী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাতের হ্যারিকেনটা মুখের কাছে তুলিয়া কহিল,—'একেবারে নিবিয়ে দোব!' বলিয়া হ্যারিকেনের কলটা ঘুরাইল, কিন্তু না নিভিয়া শিখাটা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

কথাটার উত্তরে, আলোকের আকস্মিক দীপ্তিতে নিরঞ্জন মুখ ফিরাইয়া তাকাইতেই তাহার চোখে পড়িল—আলোকপ্রভা-দীপ্ত অভিসারিকার লাজত্রস্ত হস্তের অপটু প্রসাধন-মণ্ডিত মুখ। ক্ষণেক তাহার দৃষ্টিও ফিরিল না।

তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া কিশোরীর অন্তরের বিজয়িনী কন্যা বড় তৃপ্তিতে হাসিল। ঠোঁটের আগায়ও তাহার তরঙ্গ আসিয়া খেলিয়া গেল।

মুহূর্তে নিরঞ্জনের মুখ আবার দর্শনের পাতায় ঝুঁকিয়া পড়িল। সে শ্লোক আওড়াইয়া গেল,—কিন্তু পুঁথির মাঝে আখর কয়টির সন্ধান মিলিল না। কিশোরীর মুখ ম্লান হইয়া গেল, তবু সে কহিল, —'রাত হয়েচে,...শোবে এস।'

নিরঞ্জন কহিল,—'হ্যাঁ, যাই; না এইটা শেষ করে ফেলি,— দে—দেরী আ—ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আলোটা যেমন সহসা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি সহসা নিভিয়া গেল,—শুধু মিট্ মিট্ করিতেছিল স্তিমিতালোক দীপশিখাটি। কিশোরীর ইচ্ছা করিল ওটা শুদ্ধ ফুঁ দিয়া নিভাইয়া ঘরখানার মাঝে অমাবস্যার অন্ধকার ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু তাহা ত পারা যায় না।

সহসা সে বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। পলে,

অনুপলে, দণ্ডে, প্রহরে রাত্রি বাড়িয়া যায়। নিরঞ্জন বারবার নিস্পন্দ নারীটির পানে তাকাইয়া শেষে দীপ নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

নিদ্রা আসে না। খানিক এপাশ ওপাশ করিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

নিদ্রাহীনা বধূটির মনে জাগে বিধুর কথা—এমন হতচ্ছেদ্দার ভাতের মুখে ঝাঁটা···আমরা হলে···

চিন্তায়, অভিমানে, লজ্জায় সে উন্মাদ হইয়া উঠিল, শেষে দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল—একেবারে রাস্তায়।

অসীম দুনিয়া, অনন্ত কোটী পথ, লক্ষ দিকে তার গতি,—কিশোরী পথ ধরিয়া চলিল।

সকালে পেঁচোর ডাকে নিরঞ্জনের ঘুম ভাঙিল।

পেঁচো কহিতেছিল,—'ভ্যালা আক্কেল যা হোক বাপু, সদর দুয়োর খোলা, কুকুরে এটো-কাঁটা নিয়ে নষ্কাকাণ্ড করেছে। বৌঠাকরুণ গেল কোথা?'

নিরঞ্জন কহিল,—'কোথা গেল দেখ।'

সন্ধান মেলে না। বিধুব বাড়ী, যুঁই বৌর বাড়ী, রজনের বাড়ী, ঘাটমাঠ, এদিক-ওদিক—কোথাও না।

তবে?

পেঁচো কহিল,—'হ্যাঁ দাদাঠাকুর—তবে?'

নিরঞ্জনও বলে,—'হ্যাঁ পেঁচো, তবে?'

বিধু আসিল, যুঁই বৌ আসিল।

বিধু কহিল,—'এ্যাঁ, শেষে এই করলে গো!'

যুঁই বৌ কহিল,—'কে জানে মা, আমরা ত ছুঁড়ী হতে বুড়ী হলাম—আমরা ত···'

পেঁচো কহিল,—'তা মা, তাকে দোষ দিচ্চ দাও, মুখের টেক্স নাই; কিন্তু দাদাঠাকুরের যে হতচ্ছেদ্দা। মানুষে সইতে লারে। বলি মানুষ বলে রা—তো কাড়তে হয়! হ্যাঁ—'

উত্তরে নারীর দল কত কথা বলিল। কিন্তু কেহ কোনো উত্তর করিল না। এক তরফা বক্তৃতা ভাল জমে না, অগত্যা তাহারা চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন পেঁচোকে কহিল,—'কি বল্লে ওরা পেঁচো—বল্ দেখি!'

পেঁচো নিরঞ্জনের এই বোকামিতে হাসিল না। কথাটা ঘুরাইতে কহিল,—'তা দাদাঠাকুর, বাপের বাড়ী যায় নাই ত রাগ করে—এ্যাঁ—।'

নিরঞ্জন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ব্যগ্রভাবে কহিল,—'তাই, তাই হবে পেঁচো, বাপের বাড়ীই গিয়েচে সে—, কি বলিস এ্যাঁ—! তা তু একবার দেখে আয় ক্যানে—এ্যাঁ—।'

পেঁচো কহিল,—'এখুনি চল্লাম আমি, এই ত চার কোশ রাস্তা, নাই সন্ধ্যে হতে ফিরে আসব আমি, তুমি আঁদা-বাড়া করে খাও।'

নিরঞ্জন কহিল,—'পয়সা নিয়ে যা, জল খাবি।' বলিয়া একটা আধুলি আনিয়া ফেলিয়া দিল।

পেঁচো বলিয়া গেল রাঁধিতে কিন্তু রাঁধা হইল না; বুকের মাঝে মনের মানদণ্ডে তখন বর ও বধূটির অপরাধের ওজন চলিতে-ছিল। বারবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়াও নিরঞ্জন দেখিল, ওই পেঁচোর কথাটাই ঠিক। ওই কথাটাই সব চেয়ে বড় হইয়া দাঁড়ায়,—'দাদা-ঠাকুরের যে হতচ্ছেদ্দা উ মানুষে সইতে লারে।' আত্মগ্লানির সীমা থাকে না, সমস্ত বুকখানা চড়-চড় করিয়া উঠে। বেলা সন্ধ্যার দিকে গড়াইয়া চলিল, আর বেদনার উপর উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। ঘর আর বাহির করিতে করিতে পা টাটাইয়া উঠিল,

পথের বাঁকে কাহাকেও দেখিলেই বুকখানা গুর্ গুর্ করিয়া উঠে—ওই পেঁচো!

অবশেষে পেঁচো আসিল—পেঁচোকে দেখিয়া নিরঞ্জন কিন্তু ব্যগ্রতায় আগাইতে পারিল না, পিছাইয়া ঘরে ঢুকিল।

পেঁচো ঘরে ঢুকিয়া ম্লানমুখে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—'না'।

এই মৃদু কণ্ঠের ছোট্ট কথা—'না'টী বাজের ঘায়ের মতই নিরঞ্জনের কানে ঠেকিল। সে কোন উত্তর করিতে পারিল না। মাথায় হাত দিয়াই বসিয়া রহিল, আর চোখ হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িতেছিল—টপ,—টপ,—টপ!

চোখের জলে মনের পাপ, বুকের তাপ হয়তো ক্ষয় হয় কিন্তু বাহিরের পাপ তো ক্ষয় হয় না! ওপাড়ার মুখুজ্জে আসিয়া কহিলেন,—'তাই তো, এ তো বড়···এঁ্যা—'

যদু ভট্চাজ কহিল,—'হঁ্যা—বড়ই···তা কি আর করবে বল।'

মুখুজ্জে কহিলেন,—'করতে হবে বৈ কি, এদিকের একটা—'

যদু ভট্চাজ কহিলেন,—'হঁ্যা—সে তো করতেই হবে, এখন কুশপুত্তলীই ব্যবস্থা।'

মুখুজ্জে কহিলেন,—'তাই করতে হবে; নিরঞ্জন তো জ্ঞানী, বলতে তো বেশী হবে না। তা—কি বল বাবা—এঁ্যা।'

চির দুর্বল নিরঞ্জন সবলের মত আজ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—'হঁ্যা, করতেই হবে, আজই চলুন।'

মুখুজ্জে কহিলেন,—'সাধু, সাধু, বাবাজী বয়সে নবীন হলে কি হয়, জ্ঞানে প্রবীণ।'

যদু ভট্চাজ কহিলেন,—'বেশী আয়োজনও নয়, পলাশ পাতা, কড়ি, কুশ, আর সব সামান্য—'

ব্যবস্থা হইল।

নিরঞ্জন কুশ-পুত্তলিকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিল—

—'কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম···ধর্মাধর্ম সমাযুক্ত লোভ মোহ-সমাবৃতং, দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু—।'

কিন্তু মন তবু মানিতেছিল না এই মন্ত্রশক্তিকে। এই ক্রিয়ায় সে কি স্বর্গে—দিব্যলোকে না হউক, মর্ত্যে—পবিত্র স্থানে, স্থান পাইবে? সে কি পাপ মুক্ত হইবে? আবার নিরঞ্জন কাঁদিল।

পেঁচো ঘর আগলাইয়া বসিয়াছিল। সে কহিল,—'তা তুমি আর কি করবে বল, তার যা নেকন; তা লইলে মরদে কত বলে, বলে মেরে হাড় ভেঙে দেয়, তা কে আর কি করচে বল! তার কপালে ওই বেশ্যেগিরি নেকা আছে—তা আর···।'

নিরঞ্জনের সমস্ত অন্তরাত্মা কহিল, এ-ই সত্য। এই অমার্জিতা নারীর অন্তরের এই অমার্জিত সত্য, এই বাস্তব, এই সত্য! সে ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—'কোথা সব ওই করতে যায়, জানিস পেঁচো?'

পেঁচো কহিল,—'কোথায় যায়, দাদাঠাকুরের শুধোন দেখ দেখি? উ কোথা নাই? তবে সহরে বেশী, কলকাতা, বদ্দমান।'

তারপর কতকগুলা পয়সা নামাইয়া দিয়া কহিল,—'আধুলির পয়সা তোমার, দু আনা খরচ হইচে, এক আনার মুড়ি, এক আনার বিড়ি।'

নিরঞ্জন কহিল,—'কই বিড়ি একটা দেখি পেঁচো, খেলে মাথা ঘোরে, নয়? দেখি, দেখি।'

পেঁচো কয়টা বিড়ি আগাইয়া দিল। নিরঞ্জন একটা মুখে গুঁজিয়া কহিল,—'দেশলাই, দেশলাই।'

পেঁচো দেশলাইও দেয়, নিরঞ্জন বিড়ি টানিয়া কাশে, টান দুই-তিন সজোরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল,—'দূর, মাথা ঘোরে, না

ছাই হয়। হরিদাস মহান্ত গাঁজা খায়—নয়?' বলিয়া বাহিরের পানে পথ ধরিল।

পেঁচো ম্লান মুখে পিছনে পিছনে বাহির হইয়া উন্মুক্ত বহির্দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া আপন বাড়ীর পানে পথ ধরিল। নিরঞ্জনকে ফেরান দূরের কথা—বলিতেও কিছু পারিল না, শুধু বুক চিরিয়া তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

হরিদাস মহান্ত পরম আগ্রহভরে গাঁজা টিপিতে টিপিতে কহিল,—'খেয়ে দেখ, মন উদাস করতে এমন জিনিষ আর নাই; ইষ্টদেবতাকে বুকের মাঝে দেখতে পাবে। দেবদুর্ল্লভ জিনিষ গো—, মহাদেব হরিসাধন করতে ইয়ের ছিষ্টি করেছিলেন, লয় দাদাঠাকুর?'

নিরঞ্জন কথা কয় না, কত কি ভাবে, চিন্তাহীন চিন্তা। সহসা সে বলিয়া উঠে,—'সাজ সাজ মহান্ত, আর দেরী ক'র না—।'

আঃ—আর দেরী যে সয় না—সংসারটা শূন্য ধূমে ভরা অস্পষ্ট কতক্ষণে হইবে—আঃ—!

মহান্ত অগত্যা তাড়াতাড়ি সাজিয়া কলিকাটা মাটির উপর রাখিতেই নিরঞ্জন কলিকাটা তুলিতে গেল। মহান্ত ব্যাঘ্র-ঝম্পনে বাধা দিয়া কহিল,—'হাঁ—হাঁ—রাখ, রাখ, নিবেদন করি—নিবেদন করি—।'

কলিকাটার উপর হাত ঘুরাইয়া তালি মারিয়া নিবেদন হয়—

'জয় নিতাই চৈতন্য গোপাল গদাধর
মহান্ত কুলের রাজা নরোত্তমদাস
গোবিন্দায় নমঃ—গোবিন্দায় নমঃ।

লাও দাদাঠাকুর টান—।' বলিয়া এক টুকরা কাল চটচটে

ন্যাকড়া জড়াইয়া কলিকাটা তুলিয়া নিরঞ্জনকে আগাইয়া দিল। বিশ্রী গন্ধ—! মনে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব!

'নাঃ—তুমি খাও মহান্ত!'

মহান্ত সাগ্রহ ব্যগ্রতায় নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া কহিল,—'আরে, হ'ল কি দাদাঠাকুর, বস, বস। খাও, দাদাঠাকুর খাও, মনের দুঃখ, বেদনা—সব যাবে। আহা পরিজনের শোকটা বড় লেগেছে, নয়! আহা দাদাঠাকুর, কি যে হ'ল বৌটার—কোন অটালে......এঁ্যা...।'

নিরঞ্জনের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—এই 'অটাল' কোন্ অজানা জঘন্য পল্লী—তারই মাঝে কিশোরী......আর সে ভাবিতে পারিল না।

মহান্তর হাত হইতে কলিকাটা লইয়া সজোরে একটা দম দিল।

ক্ষণপরে কহিল,—'দূর—দূর—ঘুরে ফিরে তাই—ও-ছবি আর মোছে না।'

অন্তহীন ভাবনায় দেবতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল।

মূক বিগ্রহ—সাড়া নাই—শব্দ নাই—

সহসা নিরঞ্জন উঠিয়া বসিল। বিগ্রহের মুখপানে চাহিয়া চোখের দৃষ্টি বুঝি শূন্য—মনের মাঝে সেই মুখ জাগে যে। সে প্রদীপটা বিগ্রহের মুখের পরে তুলিয়া ধরিল—জ্বল-জ্বলে চোখ—অনিমেষ দৃষ্টি—।

উন্মাদের মত নিরঞ্জন প্রশ্ন করে,—'কোথা সে—?'

মূক বিগ্রহ, বাক্ তাহার ফোটে না, শুধু তেমনি চাহিয়া থাকে—জ্বলজ্বলে চোখের অনিমেষ দৃষ্টি দিয়া।

নিরঞ্জন ঘৃণাভরে কহে,—'ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে দেখ—পলক পড়ে না! দোব, খুঁচে দোব—।'

সে প্রদীপটা আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়—অন্ধকার জাগিয়া উঠে গাঢ়, নিবিড়, তবু তাহার মাঝে জাগে যেন দুইটি চোখ। নিরঞ্জনের মনে হয়, কোন সুদূর 'অটালের' অন্ধকারের মাঝে—এ-দৃষ্টি যেন তাহার কিশোরীর! সে বাহির হইয়া পড়ে।

সহরের সঙ্কীর্ণ গলিপথ—

ড্রেনের দুর্গন্ধ, ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটি, ধোঁয়ায় অন্ধকার, রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর রক্তাভ, ম্লান।

দুপাশে গোলপাতার মেটে ঘর, ছোট ছোট দরজা, প্রতি দরজার সম্মুখে চার-পাঁচটি করিয়া নারী।

নিরঞ্জন গলিপথে ও মোড়ে ঢোকে, দরজার সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, দেখে, আবার চলে—

অন্ধকার যেখানে বেশী, সেখানে দেশলাইএর বাক্সটা বাহির করিয়া ফস্ করিয়া কাঠি জ্বালে—।

নারীর দল আলোর আঘাতে যেন চমকিয়া উঠে, সে মুখ যেন আলোয় দেখাইবার নয়—

কেহ মুখ ফিরায়, কেহ গালি দেয়।

নিরঞ্জন ভাবলেশহীন মুখে বলে,—'কিশোরীকে খুঁজছি! কিশোরী থাকে এখানে? কিশোরী……কিশোরী……।'

গলিটা শেষ হয়, অন্য গলি ধরে……

॥ সর্বনাশী এলোকেশী ॥

মহা পাষণ্ড, বদ্ধ-গোঁয়ার বলরাম দাস, নহিলে সামান্য একটা কারণে সে যে-কাণ্ড করিয়া বসিল মানুষ তা' করে না—করিতে পারে না।

মাটির মালিক, ভূস্বামী, রাজা, লক্ষ্মীর বরপুত্র—তাঁহাকে দেশে না মানে কে? শাস্ত্রে বলে 'সর্ব দেবময়ো রাজা'। তিনি যদি অন্যায়ের জন্য তুইটা অপমানই করিলেন, দশ টাকা জরিমানাই করিলেন, তাই বলিয়া কি দেশান্তরী হইতে হইবে, পৈত্রিক-ভিটা সব পরিত্যাগ করিতে হইবে?

তোর বাপ, তোর পিতামহ, তারা কি জমিদার রাজাকে মানিয়া যায় নাই? আর জরিমানা? সে ত প্রজার ধনে রাজভাগ একটা, শাস্ত্রানুযায়ী তাঁহার প্রাপ্য!

হরিশ ভট্‌চাজ মিথ্যা বলে না,—'গোঁয়ার আর বলে কাকে দাদা? গোঁয়ার গাছেও ফলে না, মাটীতেও গজায় না, গোঁয়ার ওই ওকেই বলে।'

বুড়া চাটুজ্জে বলেন,—'বেটার লেজ গজিয়েছে হে। দেবতা ব্রাহ্মণ কাউকে মানা-মানি নাই! পড়বে, বেটা পড়বে, তুমি দেখে নিয়ো ভায়া, এমন পড়া পড়বে বেটা। অতি বাড় বেড়ো না—কথাটা শাস্ত্র বাক্য—বুঝলে, ও মিথ্যা হবার নয়।'

আবার দশের কাছে বলরাম পরিচয় দেয়,—'আমরা ত্রিপুরা-ভৈরব বৈষ্ণব, আমরা কারও তোয়াক্কা রাখি না।'

বৈষ্ণব জাতির ইতিহাসের মধ্যে এমন কোন একটী শাখার অস্তিত্ব আছে কি না কে জানে, বলরাম কিন্তু ত্রিপুরা-ভৈরব

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন, আহার-বিহার সম্পর্কে একটী বেশ ধারাবাহিক পরিচয় দিয়া শাস্ত্র বাক্যের দোহাই পাড়ে—

'কারণ' বারিতে আগে কর আচমন।
মৎসে মাংসে ভোগ পরে করিবে নিবেদন।

এমন ছন্দোবদ্ধ শাস্ত্রবাক্যেও যদি লোকে অবিশ্বাস করে তবে সে দুহাতের বুড়া আঙ্গুল লোকের মুখের কাছে নাড়িয়া দিয়া কহে—

'কাঁচ-কলা, বিশ্বাস না করলি ত আমার কাঁচ-কলা—'

বলিয়া রাগের বশে পড়্ পড়্ করিয়া জোরে জোরে হুঁকা টানে। টানিতে টানিতে আবার গোঁয়ারের গোঁ বাড়িয়া যায়, ঠক্ করিয়া হুঁকাটা দাওয়ার উপর নামাইয়া কহে—

'আমি খাব, আমি মদ খাব—মাংস খাব, আমার যা মন তাই ক'রব—তাতে কোন শালার কি?'

উত্তরোত্তর ক্রোধের মাত্রা বাড়ে, কহে,—'ভাগ শালা ভাগ, নিকালো আমার বাড়ী হতে—আভি নিকালো।'

সামনে যে থাকে সে যদি মানে মানে 'নিকালিল' ত' ভাল, নতুবা বলরাম গলা ধরিয়া 'নিকালিয়া' দিবে।

তারপর আপন মনেই যেন আক্ষেপের সুরে কহে,—'দেখ দেখি বাপু, লোকের পেছনে লাগা। শালা মাগ না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো—আমি কার তোয়াক্কা রাখিরে বাপু? যত সব মরুঞ্চ টিক্‌টিকির দল, গায়ে এক কড়া মুরদ কারু নাই, সমাধি খুঁড়তে হলে তখন বাবা বলরাম ছাড়া গতি নাই, এস ডাকতে শালারা এইবার।'

সত্য, ওই দুর্ধর্ষ জোয়ানটি গ্রাম গ্রামান্তরে বৈষ্ণবদের সমাধি সৎকার একাই অক্লান্ত ভাবে করিয়া যায়। ঝগড়া বহু জনের সহিতই হয় কিন্তু শেষের দিনে সে ঝগড়া বলরাম মনে রাখে না, সেদিন অম্লান চিত্তে পরম কৌতুকের সহিত শেষের কাজ করিয়া যায়।

মৃতের সঙ্গেও কৌতুক রহস্য ওর—যেন কিছুই হয় নাই। আবার এমন নির্মম ভাবে শব-দেহগুলিকে নাড়া-চাড়া করে যে লোকের মন আপনি বিষাইয়া উঠে! কিন্তু সত্য কথা বলিবার ত উপায় নাই, সত্য কথার কালও এ নয়। আর লোকটিও সোজা নয়।

সকলেরই বিশ্বাস চুরি ডাকাতি, ঘরে আগুণ, কোন কর্মটাই বলরামের পক্ষে অসাধ্য নয়, কথায় কথার চড়-চাপড় ত অতি সোজা কর্ম। তা ছাড়া লোকে অধার্মিক নয়, তাহারা শাস্ত্র-বাক্য হেলন করে না, অপ্রিয় সত্য বলিয়া অধর্ম তাহারা করে না, ফলও তাহার হাতে হাতে মেলে। মিষ্ট কথায় তুষ্ট বলরাম দোকানে ত ধার দেয়ই উপরন্তু তাহার নিজের হাতের রচা পাঁচ বিঘা বাগানের শাকে সব্জীতে আঁচল ভরিয়া দিয়া কহে—

'নিয়ে যাও দাদা, নিয়ে যাও। আমার খাবেই বা কে, করবই বা কি? তোমরা পাঁচ জনে খেলেই আমার দেহের শ্রম সার্থক হবে।'

লোকে বুদ্ধিমান, লোকে ধার্মিক—বলরামের মত নয়।

সেদিন বুড়া চাটুজ্জে অতি কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিয়াছিলেন—কাঁকালে ডালায় নুন, তেল, দাল—আর পিঠে গামছায় বাঁধা সব্জীর বোঝা।

পথে ভট্চাজ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দাদা হাঁপাচ্ছেন যে, কি সব এত নিয়ে চলেছেন?'

চাটুজ্জে মহাশয় আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—'আর বল কেন ভাই, শালা গোঁয়ার, দিলে গাধার বোঝাই পিঠে চাপিয়ে; ওই হারামজাদা বলরাম বোরেগী হে; কি করি বল, যে গোঁয়ার, না বলবার ত জো নেই, নইলে শূদ্রের দান, রাধে রাধে! দেখি হুঁকোটা একবার দাও।'

হুঁকায় টান দিতে দিতে কহিলেন,—'শালা অহঙ্কার আর দেখাতে

পাচ্ছে না হে, মাটিতে পা পড়ে না, ধনের আর দেহের অহঙ্কারে। কিন্তু ভগবান আছেন দর্পহারী, রক্তের তেজ তিনি কারও রাখেন না, বুঝেছ? দেখো, আমি বলে রাখলাম হরিশ, ওর কি হয় দেখো; শেষ পর্যন্ত ওর যদি মহাব্যাধি না হয় ত কি বলেছি আমি। বৈষ্ণব হয়ে মদ, মাংস,—রাধে, রাধে!'

হরিশ গামছার গিঁটটা ফাঁক করিয়া সজীগুলি দেখিতেছিল, চাটুজ্জে পোঁটলাটা সরাইয়া রাখিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন—

'শালা মুরগীও খায় হে। আমাকে সেদিন খানিকটা মাংস দিয়েছিল ভায়া—বল্লে, পক্ষী মাংস—ফাঁদ পেতে 'সরাল' পক্ষী ধরেছি; সরু সরু হাড়,—তা আমি ভাবলাম সরাল ত বন্য হংস—এ না হয় খেতে পারা যায়। কিন্তু ভায়া দেখি মাংস অতি সুস্বাদু, ও মুরগী না হয়ে যায় না! নিশ্চয় মুরগী—রাধে রাধে! শালা ডাকাত হে। ওই দত্যির মত দেহ, পাঁচ বিঘে বাগান একা কোপায়—ও ডাকাতি করে না বলছ তুমি? নিশ্চয় করে, আমি বলছি, নিশ্চয় করে—নইলে এত টাকা ওর হ'ল কি করে? নাও, ছাড়—ছাড়, উঠি।'

ভট্‌চাজ আবার গামছা টানিয়াছিল, চাটুজ্জে উঠিয়া গামছার বোঝা পিঠে ফেলিয়া কহিলেন,—'যাও না ভায়া বেড়াতে বেড়াতে একবার, দুটো মিষ্টিকথা বল্লেই বাস্, বুঝেছ কিনা—' বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ভট্‌চাজ শঙ্কাভরে কহিল,—'যে গোঁয়ার বেটা।'

চাটুজ্জে গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—'তা বটে মহা পাষণ্ড। ভগবান আছেন।'

মহা পাষণ্ড তাহাতে সন্দেহ নাই। নহিলে শাল না, সেগুন না,—ফল না, মূল না—এ সামান্য একটা ফুলের গাছ, তাহাতে মুখ দেওয়ায় কে কোথায় গো-হত্যা করিয়া বসে?

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এই—

বলরাম দোকানের পাশেই বহু যত্নে একটি হেনার ডাল আনিয়া পুঁতিয়াছিল। দিনে দশবার তাহার গোড়ায় বসিয়া সবুজ একটি অঙ্কুর-কণা-বিকাশের প্রত্যাশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে সেই গাছটি পাতায় পাতায় ভরিয়া সতেজ একটি শিশুর মত দিন দিন নব নব লাবণ্যে ও পরিপুষ্টিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল। বলরাম হুঁকাটি হাতে বার বার গাছটির কোমল পাতাগুলিতে মায়ের মত নিবিড় স্নেহে হাত বুলাইত আর কোমল একটি সুখস্পর্শে বলরামের উগ্র চোখ দুটি যেন মুদিয়া আসিত!

সেদিন সবে বলরামের ভাতের নেশাটি ধরিয়া আসিয়াছে, মৃদু মৃদু নাক ডাকিতে ধরিয়াছে, এই অবসরে কোথা হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার একটা বাছুর আসিয়া গাছটি মুড়াইয়া খাইতে সুরু করিল! প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে এমন সময় বলরামের ঘুম ভাঙিল।

দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে, দুর্দান্ত লোকটি যেন মূক হইয়া গেল—বিস্ফারিত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত সে ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুটার স্পর্ধা দেখিল—তার পর প্রচণ্ড রাগে পাকা বাঁশের লাঠিটা লইয়া ঝাড়িয়া দিল বাছুরটার পিছনের পা চাপিয়া।

ওই এক লাঠিতেই বাছুরটা একটা অতি কাতর শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তবু বলরামের রাগ যায় না, বাছুরটার বেদনা-বিস্ফারিত বড় বড় কাল চোখ দুইটির সম্মুখে লাঠিটা বার কয় ঠুকিয়া কহিল—

'ওঠ্ শালা, ওঠ্, আবার কলা ক'রে পড়ে আছে দেখ না; ওঠ্ বলছি ওঠ্!' বলিয়া আবার দুই লাথি।

ভয়বিহ্বল জীবটি বার কয় পা কয়টা আছড়াইয়া উঠিবার ব্যর্থ

চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। নিরুপায়ে একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হতভাগ্য জীব নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা কয়টি ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল—পাতার সে কম্পিত আন্দোলনের চাপে দুইটি জলের ধারা গড়াইয়া গেল; শুধু কয়টি বিন্দু জল চোখের পাতার দীর্ঘ রোমে শিশির বিন্দুর মত চক্ চক্ করিতে থাকিল।

অবিরাম বর্ষণেও পাথর গলে না, ক্ষয় হয়তো হয়; কিন্তু ওই দুর্বল পশুটির কয় ফোঁটা চোখের জলে পাষাণে গড়া মানুষটি গলিয়া গেল। হাতের লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া বলরাম বিস্ফারিত নেত্রে পশু শিশুটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, কিন্তু বড় সঙ্কোচভরে—

মানুষের লালসার অত্যাচারে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত কঙ্কালসার জীব, উদরের জ্বালায় অতি প্রলোভনে ওই সুশ্যাম সুরস গাছটিতে মুখ বাড়াইয়াছিল, মুখের পাশ গড়াইয়া সবুজ রস মিশ্রিত লালা এখনও গড়াইয়া পড়িতেছে, কয়টা পাতা এখনও গোটাই রহিয়াছে!

অসীম করুণায় বলরাম তাহার প্রকট পঞ্জরগুলির উপর হাত বুলাইল।

স্নেহ-স্পর্শবোধ বোধ হয় জীবজগতের জন্মগত বৃত্তি—

ওই অবোধ পশু বড় বড় কালো চোখ তুলিয়া বলরামের মুখপানে চাহিল, তাহার প্রসারিত হাত দুইখানি জিভ দিয়া চাটিতে সুরু করিল!

বলরাম কাঁদিয়া ফেলিল।

উজ্জ্বল রৌদ্রপ্রভায় ধরণীর রূপ যেন মণিদীপ্তির মত ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। গাছের পাতায় সে প্রভার দীপ্তি, নীল আকাশ আভায় ঝল-মল,—দূর্বার অগ্রবিন্দুটী পর্যন্ত যেন সবুজ মণিকণা; কিন্তু বলরামের মনে হইল রূপে বর্ণে সমুজ্জ্বল ধরণী সহসা মলিন

বিবর্ণ হইয়া গেছে, তাহারই নির্মম দলনে রূপ লাবণ্য সব বীভৎস দুর্গন্ধময় হইয়া গেল।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ত অনুতাপ। পরপারের খাতায় চোখের জলে হয়ত পাপের ইতিহাস মুছিয়া যায়, কিন্তু সংসার বড় কঠিন স্থান, সেখানে পাপের নাম অন্যায়—সে অন্যায় চোখের জলে মুছিয়া যায় না, মানুষ মানুষকে এত সহজে রেহাই দেয় না।

বলরামও রেহাই পাইল না। তার উপর সে খোঁচা মারিয়াছিল ভীমরুলের চাকে; ওই দুর্ভিক্ষপীড়িত গোবৎসটী হইতেছে এ চাকলার জমিদার বাবুর। ধনের গাদায় ও জনের মাথায় তিনি বসিয়া আছেন, অন্যায়ের দণ্ডবিধানের ভার স্বেচ্ছায় তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সহজে ছাড়িবেনই বা কেন? স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা দায়িত্বের গুরুত্ব যে বড় বেশী।

সন্ধ্যার কাছাকাছি জন চার চাপরাশী আসিয়া হাজির—'চলো তুম্‌হি, বাবুর তলব আসে।'

বলরাম তখনও বাছুরটীকে সেঁক দিতেছিল, মুখের গোড়ায় তার কচি কচি ঘাসের বোঝা, চোখ বুঁজিয়া রোমন্থন করিতে করিতে সে পরম আরামে সেঁক লইতেছিল।

বলরাম মুখ না তুলিয়াই কহিল, —'কাহে?'

চট্‌ করিয়া একজন বলরামের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, —'পাকড়কে লে যানে কো হুকুম হ্যায়, বাবুর বাছুর মারিয়েসো তুম্‌হি। ই বাছুর বাবুকে আছে।'

বলরাম ভ্রূকুটী করিয়া উঠিল। এমন ভাবে হাত চাপিয়া ধরিতে দেওয়ার অভ্যাস বলরামের কোনদিন ছিল না, একথা দশেও জানিত; সেই জন্যেই চার চার জন লোক একটা লোককে ডাক

দিতে আসিয়াছিল, আর ডাক শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল।

কিন্তু কি জানি কেন আজ বলরাম ভ্রূকুটী সম্বরণ করিয়া কহিল,—'ধরতে হবে না, চল যাচ্ছি আমি; দাঁড়াও একটু, দরজা বন্ধ করি।'

ঘরে ঢুকিয়া দোকান সামলাইয়া বাছুরটীকে কোলে করিয়া সে আজ বাবুর কাছারীতে অপরাধীর মতই মাথা হেঁট করিয়া চলিল। চাটুজ্জে আসিতেছিলেন দোকানে, পথে দেখা হইতেই তিনি কহিলেন,—'কোথায় যাচ্ছ বাবা বলরাম?'

বলরাম উত্তর দিল না, উত্তর দিল চাপরাশী,—'বাবুকে কাছারীমে ধরিয়ে লিয়ে যাচ্ছে।'

চাটুজ্জে ব্যগ্র ভাবে কহিলেন,—'কেয়া ব্যাপার হোতা হুয়া।'

চাপরাশী কহিল,—'বলরাম বাবুর বাছুর মারিয়েসে ঠেঙাইয়ে!'

চাটুজ্জে আর কথা কহিলেন না, লোক কয়টা বেশ একটু দূর চলিয়া গেলে লম্বা লম্বা বকের মত পা ফেলিয়া বলরামের বাগানে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিলেন,—'রাধে রাধে, বৈষ্ণব হয়ে গো-হত্যে! আরে গায়ে শক্তি আর ঘরে ধন থাকলে কি এমনি ব্যভিচারই করে রে বাপু!'

:

বাবু মুখে বিশেষ কিছু কহিলেন না। বলরাম বাছুরটী নামাইয়া নত হইয়া নমস্কার করিতেই তিনি কহিলেন,—'হারামজাদা বোরেগী শালা—'

তারপর যাহা কিছু হাতে-হাতিয়ারে। পায়ের চটীটা হাতে লইয়া ওই নতুন চক্‌চকে চটী দিয়া বেশ ঘা কতক। আরও হয়তো ঘা কতক পড়িত, কিন্তু প্রবীণ নায়েব হাঁ হাঁ করিয়া হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন,—'বেটা শয়তান ধর্মভ্রষ্ট, ওর অঙ্গ স্পর্শ করা কি আপনার

শোভা পায়? দিক বেটা পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আর পঞ্চাশ টাকা খেসারৎ।'

পরে বাবুকে ঘরের ভিতর বসাইয়া নায়েব মৃদু স্বরে কহিলেন, '—সব্বনাশ, সব্বনাশ, ওই বেটা গোঁয়ারের গায়ে কি নিজে হাত তুলতে আছে, বেটা ডাকাত যদি—'

নায়েব শিহরিয়া উঠিয়া কহিল,—'যদি আপনার হাত ধরে ফেলত বেটা, কি—; যাক, দিক বেটা একশো টাকা জরিমানা। হাতে মারি না ভাতে মারি,—উঃ বেটা যে কিছু করেনি এই আশ্চর্য।'

বলরামের এমন ধারা হীন নির্যাতন সহ্য করা সত্য সত্যই আশ্চর্য!

বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা বলরাম দরজার গোড়ায় আসিয়া কহিল,—'তা হ'লে আমি জরিমানা আর খেসারৎ এনে দি।'

বাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ সংসারে এমন ক্ষেত্রে লোকে পায়ে লুটাইয়া কাঁদে আর শক্তিমানের তাহাতেই সব চেয়ে বেশী আত্মপ্রসাদ; মানুষকে পায়ে দলিবার জন্য মানুষ চিরদিন শক্তি সঞ্চয় করে; বুকে বাঁশ দিয়া দলিয়া তাহার কাতর ক্রন্দনে গলিয়া ক্ষমা করিয়া শক্তিমান দয়াল হয়। শুধু তাই কেন? গৃহস্থ যে ভিক্ষুককে করুণা করিয়া ভিক্ষা দেয় তারও মধ্যে এই নিষ্ঠুরতার প্রভাব সূক্ষ্ম ভাবে রহিয়াছে। ভিক্ষুক জোড় হাত করিয়া ভিক্ষা চায় তাই গৃহস্থ করুণা করে, অনাহারী দরিদ্র মানুষ মানুষের অধিকারে দাবী করিলে পায় না ত কিছুই উপরন্তু ভাগ্যে জোটে লাঞ্ছনা।

বাবুর ক্রোধ বোধ করি ফাটিয়া পড়িত কিন্তু বাস্তব রাজ্যের লোক নায়েব তাহার পূর্বেই কহিলেন,—'আধ ঘণ্টার মধ্যে, আধ

ঘণ্টার মধ্যে টাকা হাজির-করা চাই। যাও শিউশরণ সাথমে যাও, আধ ঘণ্টাকে বাদ গলায় গামছা দিয়ে লে আনা।'

বলরাম ফিরিল কিন্তু আধ ঘণ্টার আগেই। টাকাগুলি ফরাসের উপর ঢালিয়া দিয়া বলরাম ছোট একটী প্রণাম করিয়া আহত বাছুরটীকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল; পশুটী মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। বাছুরটার জন্য খেয়াল এতক্ষণের মধ্যে কাহারও হয় নাই, বলরাম তাহাকে স্পর্শ করিতে শিউশরণ চাপরাশী কহিল,—'বাছুর রাখিয়ে দেও, মাহিন্দার উস্কো লে যায়ে গা।'

নায়েব বাবু কহিলেন,—'ও বাছুর তুমি নিয়ে যাও হে, অপঘাতে গো-হত্যে আমাদের বাড়ীতে হয় কেন?'

বলরাম বাছুরটীকে কোলে করিয়া উঠিয়া পড়িল।

নায়েববাবু আবার হাঁকিয়া কহিলেন,—'হ্যাঁ, নিয়ে যাও, কিন্তু খবরদার, মলে যেন ভাগাড়ে দেবে না, পুঁতে দেবে।'

জমিদার বাড়ী গো-মাতা মরিলেও তাহার শবে ছুরিকাঘাত হইতে দেওয়া হয় না।

বলরাম চলিয়া গেলে নায়েব বাবুকে কহিল,—'ও তো বাঁচবেই না, গো-হত্যের পাতকের ভাগ আমরা নিই কেন?'

পরদিনই বলরাম গ্রামের বাহিরে তেপান্তর মাঠে এক ঘরের বনিয়াদ ধরিল। এই স্থানে বিঘা দশেক নিষ্কর আখড়া করিবার জন্য বলরামের বাপ কিনিয়া গিয়াছিল।

বলরামের পণ—কর সে কাহাকেও দিবে না, জমিদারের বালাই সে রাখিবে না।

চাটুজ্জে সমস্ত শুনিয়া ভট্‌চাজকে কহিলেন,—'এ কি' করতে হয় বল দেখি, আরে রাজা ভূস্বামী—'

ভটচাজ কহিল,—'কে সে কথা গোঁয়ারকে বলবে বল ?'

চাটুজ্জে কহিলেন,—'আমাকেই বলতে হবে ভাই, আমি যে আবার বেটার দোকানে জিনিষ নিই—'

ভটচাজ কহিল,—'তার আবার ভাবনা ? দশ দোর খোলা, বেণেদের দোকান—'

চাটুজ্জে কহিলেন,—'বল কেন ভাই, একটী পয়সা বেটারা ধারে দেয় না ; তোমার অবিশ্যি যজমান সব, তোমাকে ত না করে না।'

চাটুজ্জে বলরামকে বলিলেন ও অনেক বুঝাইলেন,—'জমিদার বাপ মা, ভূস্বামী, রাজা। জানিস্ বাবা, শাস্ত্রে বলে দেবতার অংশ।'

গেঁায়ারের গেঁা, বলরাম কিছুতেই শুনিল না, হুঁকাটা ঠক করিয়া নামাইয়া কহিল,—'কাঁচকলা, জমিদার বাপ মা দেবতা না ইয়ে।' সে নতুন ঘরের দেওয়াল ফিরাইতে চলিয়া গেল।

মাস দেড়েকের মধ্যেই ঘরখানি সম্পূর্ণ হইয়া খড়িমাটীর লেপনে সুকোমল শুভ্রতায় যেন হাসিয়া উঠিল।

খড়িমাটী লেপন যেদিন শেষ হইল বোধ হয় তার দিন দুই পরই ঠিক ভোর হইতেই বলরাম আপনার সমস্ত অস্থাবর নতুন ঘরে স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করিল।

সকল বেলাতে চাটুজ্জে ডালাখানি হাতে বলরামের দোকানে আসিয়া হাঁকিলেন,—'কই বাবা বলরাম, আজ দুদিন ধরে গিয়েছিলে কোথা—দোকানে এসে এসে ফিরে যাচ্ছি।'

সহসা বোঝাই গাড়ীখানি দেখিয়া কহিলেন,—'ও মাল আন্‌লে বুঝি ? এ যে অনেক মাল হে !'

বলরাম তখন জিনিষ লইয়া টানাটানি করিতেছিল। গায়ের জোরের শৃঙ্খলাহীন টানাটানিতে জড়পদার্থগুলিও যেন আঘাতের ভয়ে পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছিল। কয়টা বাসন গিয়া

বিছানার গাদায় ঢুকিয়াছে, বিছানার একটা প্রান্ত আবার বাক্সের কোণে আটকাইয়া গিয়াছে। বলরাম প্রাণপণ শক্তিতে বিছানার এক প্রান্ত ধরিয়া টান মারিতেছিল। বিরক্তিতে তাহার মনটা উঠিয়াছে বিষাইয়া। চাটুজ্জের কথার কোন সাড়া না দিয়া সে আপন মনেই টান মারিতে মারিতে কহিল,—'হেঁই শালা হেঁই ; ছাড়ে না রে হেঁই' বলিয়া প্রচণ্ড এক টান। সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা গেল ছিঁড়িয়া আর বাক্সের একটা কোণ আসিয়া আঘাত করিল পায়ের বাঁশীতে, সমস্ত দেহটা যেন ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল—কাটিয়া রক্তও খানিকটা পড়িল।

কোন সাড়া না পাইয়া চাটুজ্জে ঠিক এই সময়টিতেই ডাকিয়া বসিলেন,—'বাবা বলরাম, বলরামরে!'

মুহূর্তে বলরাম হইয়া উঠিল আগুন। আঘাতের সমস্ত যন্ত্রণা ক্রোধে রূপান্তরিত হইয়া সেটা পড়িতে উদ্যত হইল ওই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপর।

হাতের বিছানাটা নির্মম ভাবে ফেলিয়া দিয়া সে বাহিরে আসিতে আসিতে কহিল,—'তোর ছ্যাঁচড় বামনের নিকুচি করেছে ; কেবল পিছু ডাকা, কেবল পিছু ডাকা। বাবা বলরাম—বলরাম যেন ওর সাতপুরুষের বাবা! কেন কি বলছিস্ কি বুড়ো খগ—'

বৃদ্ধ চাটুজ্জে আবার বাতের রোগী, পা দুইটা বকের মত লম্বা হইলে কি হয় তুলিতে ফেলিতেই দু-টী মাস। ইষ্ট স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একগাল হাসিয়া কহিলেন,—'কিছু ক্ষেতি হল বুঝি বাবা? পিছু ডাকা মানুষের কেমন একটা বদ রোগ। আর কি জান বাবা, ওতে মানুষের হাতও নাই। কেমন গোপনে বসে যে সব্বনাশী ডাকিয়ে দেয়! আ-হা-হা-রে, কেমন করে পা টা এমন রদ্দি করলি রে?'

আঘাতটা চাটুজ্জের নজরে পড়িয়াছিল। এর পরে আর বলরামের কিছু বলা চলিল না, পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—'বাক্সের কোণাটা, তা যাক্‌গে—মরুক্‌ গে—এমন কত লাগে!'

চাটুজ্জে ভরসা পাইয়া কহিলেন,—'কাল পরশু বুঝি সাঁইতের বাজার গিয়েছিলে মাল আনতে? এত মাল নিয়ে এলে, দোকান বাড়াচ্ছ নাকি? আচ্ছা হবে সে বাবা—বেটা বেণেদের গুমোর এবার ভাঙবে। বেটারা আবার বলে 'গদি'!'

বলরাম কহিল,—'না এ সব নতুন মাল নয়, ঘরের জিনিষ সব নিয়ে চল্লাম নতুন বাড়ীতে।'

চাটুজ্জে কহিলেন,—'সে কি আজই? না-না-বাবা বলাই, সে অনেক দূর, যাস্‌নে বাবা তেপান্তরের মাঠে! আমি আবার বেতো মানুষ—আর এ তোর পৈত্রিক বাড়ী, ঐ বাগান—'

বলরাম প্রতিবাদে চটিয়া কহিল,—'রাখ ঠাকুর তোমার পৈত্রিক বাড়ী বাগান। শালা কারু এলাকাতে বাস করছি না। চাপরাশী দোরে আসতে দেব না। ওসব আমি চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। সদরে গিয়ে কেলেক্টার সাহেবের কাছে সব ইস্তফা দিয়ে এসেছি আমি, রেজেষ্টারী নুটীশ জমিদারের নামে এল বলে। নিষ্কর নাখরাজ মাটীতে বাস করব, এবার একবার কেউ তলব শোনাতে আসুক্‌।'

চাটুজ্জে হতবাক্‌ হইয়া গেলেন। অবাক হইয়া বার্দ্ধক্য-নিষ্প্রভ চক্ষু দুটী বড় বড় করিয়া বলরামের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বলরাম কহিল,—'যাও ঠাকুর বাড়ী যাও, দোকান এখন দুদিন মিলছে না। দু দিন পর ডাঙার বাড়ীতে যেতে পার ত যেয়ো, জিনিষ দোব।'

সে ঘরের পানে পা উঠাইল। সঙ্গে সঙ্গে চাটুজ্জের মনের কথাটা বোধ করি মনে পড়িল, তিনি ডাকিয়া বলিলেন,—'বলরাম।'

উদ্যত পদ সম্বরণ করিয়া বলরাম ফিরিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল —'কি ?'

চাটুজ্জে মহাশয় ওই গম্ভীর সংহত ছোট কথাটীতে কেমন ভড়্‌কাইয়া গেলেন। হাঁকে ডাকে তিনি দমিতেন না—এ ভাবটা যে বলরামের কেমন অস্বাভাবিক !

চমকিয়া উঠিয়া চাটুজ্জে কহিলেন,—'আজকে তেরস্পর্শ বাবা, মঘাও হয় ত হবে ; আজকে আর—' বলরাম গম্ভীর ভাবেই কহিল, —'মাথার উপর টিকটিকির মত মঘা তেরস্পর্শ কাল-ডাক ডেকো না বলছি ঠাকুর। যাও বলছি, মানে মানে ঘরে যাও—'

চাটুজ্জের মেজাজটা কেমন হইয়া গেল। তিনি বলিয়া বসিলেন,— 'তা হ'লে আর বাপু আমার সঙ্গে কারবার চলবে না—কারুর সঙ্গেই চলবে না—'

চাটুজ্জে ফিরিয়াছিলেন কিন্তু বলরাম আসিয়া চাদরের খুঁট চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—'টাকা দিয়ে যাও ঠাকুর, ধারের টাকা !'

চাটুজ্জের মুখ শুকাইয়া গেল তবু তিনি খামচ্‌ কাটিয়া কহিলেন, —'টাকা কি ট্যাঁকে করে নিয়ে এসেছি নাকি !'

বলরাম চাদর ছাড়িয়া দিয়া কহিল,—'কাল কিন্তু আমার টাকা চাই। নইলে তোমার গায়ের কাপড় চাদর খুলে নোব আমি।' বলিয়া সে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাঁফ ছাড়িয়া কয় পা আসিয়া ফিরিয়া কহিলেন,— 'নির্বংশ হবে নির্বংশ হবে। বেটা মরবি তেপান্তরে জল জল করে—'

বলরাম যে অকৃতদার, শঙ্কায় ক্রোধে চাটুজ্জের সে কথাটা মনেই ছিল না।

ভূতের আবার অমাবস্যা না সম্মুখে যোগিনী, গোঁয়ারের গোঁ-এর

মুখে ত্র্যহস্পর্শ না মঘা। ত্র্যহস্পর্শ মঘা পঞ্জিকার পৃষ্ঠাতেই রহিল, বলরাম সেই দিনই গৃহত্যাগ করিয়া নতুন গৃহে গৃহপ্রবেশ করিয়া বসিল। আর করিল বিশেষ আড়ম্বরেরই সহিত। ঢোল নহবৎ বাজাইয়া, রাত্রে বন্ধু বান্ধব ভোজন করাইয়া সে এক বিরাট সমারোহ। আবার নতুন ঘরের চালের উপর এক লাল-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে। এ যেন সেই রক্ত-পতাকা উচ্চশির—গিরিকন্দরে রাণা প্রতাপের স্বাধীনতা-উৎসব।

যাক্ এ নতুন জীবন বলরামের মন্দ লাগিল না। দোকান তুলিয়া দিয়া দুইটা রাস্তার মোহড়া আগলাইয়া সে এক চালের আড়ত খুলিয়া দিল এবং পাশেই বিঘা কয় জমি ঘেরিয়া বাগান রচনা সুরু করিয়া দিল।

পৃথিবী রচিয়াছেন স্রষ্টা, মানুষ তাহাতে তুলি বুলায় এ তাহার নেশা—সৃষ্টির নেশা। সেই নেশায় বিভোর মানুষ মরুর বুকে ছায়া রচিয়াছে, যুগের পর যুগ ধরিয়া কুতব-মিনার গড়িয়াছে, তাজমহল রচিয়াছে, পিরামিড তুলিয়াছে, শূন্য প্রান্তর পৃথিবীর বুকে ইটে কাঠে পাথরে অপূর্ব উদ্যান রচনা করিয়া চলিয়াছে।

সেই নেশায় বলরাম যেন বিভোর হইয়া উঠিল। মাটীর বুকে অফুরন্ত পরিশ্রম সে করিয়া যায়, গাছে ফুল ফুটায়, ফুলে ফল ধরায়, রুক্ষ প্রান্তরের বুকে সবুজ মায়া রচনা করে, ছোট একটু গণ্ডীর মধ্যে বলরামের সেবায় রুক্ষ ভৈরবী প্রকৃতি ধীরে ধীরে মমতাময়ী বরদা হইয়া উঠেন।

দুপুরের অবসর সময়ে সে সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে অলস আঁখি মেলিয়া মরীচিকার ঝিরি ঝিরি প্রবাহ দেখে, রৌদ্রদগ্ধ বিবর্ণ আকাশের পানে চাহিয়া থাকে আর ভাবে—এই সমস্ত প্রান্তরের বুক জুড়িয়া যদি গাছের পর গাছ লাগানো যায়, তলে তলে কেমন একটি অবিচ্ছিন্ন ছায়া ফুটিয়া উঠে—ছায়ায় কোল

জুড়িয়া ঘাসের লাবণ্য আর মাঝ দিয়া যদি একটি জল ভরা আঁকা বাঁকা ছোট নদী বহিয়া যায়!

বলরাম ভাবে সে পারে, আপনার সমর্থ দেহের পানে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবে সে পারে কিন্তু জমি যে জমিদারের! মনটা তাহার বিষাইয়া উঠে।

সেই খোঁড়া বাছুরটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হয়তো সেই সময়েই আসিয়া ওর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখপানে চাহিয়া থাকে।

বাছুরটা মরে নাই, বলরামের সেবায় স্নেহে দিব্য সারিয়া উঠিয়াছে, পরিপুষ্টিতে শীর্ণ দেহখানি নধর হইয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দীর্ঘ কোমল লোমরাজি দেখা দিয়াছে, কিন্তু বলরামের আঘাত ওর অঙ্গে অক্ষয় হইয়া গেছে, একখানি পা আর সারে নাই। বলরাম কথা না কহিলে সে কখনও রাগ করিয়া গুঁতাইয়া দেয়, কখনও বা কর্‌করে জিভ দিয়া বলরামের পিঠ চাটিতে সুরু করে, বলরাম কাতুকুতুতে অস্থির হইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ওর গলাটা জড়াইয়া চুমা খাইয়া মুখপানে চাহিয়া গান ধরিয়া দেয়—

ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যেসী
আর কি তোর মনে আছে এলোকেশী।

সে বাছুরটার নাম রাখিয়াছে এলোকেশী।

এখানে আর একটা বেশ বড় রকমের সুবিধা বলরামের হইয়াছে—বৈশাখ মাসে 'জলসত্র' দেওয়ার।

এটা তাহার পৈত্রিক কীর্তি। তাহার বাপ আজীবন এই ব্রতটি নিয়মিতভাবে পালন করিয়া গেছে। বৈশাখ মাসে খর রৌদ্রে ধরণী অগ্নিকুণ্ড হইয়া উঠিলে পশু পক্ষী পর্যন্ত ছায়াতলে আশ্রয় লইয়া সভয়ে নির্বাক হইয়া থাকিত; মানুষ কদাচিৎ দেখা

যায়, যাহাকে দেখা যায় সে যেন চিতায় অর্ধদগ্ধ হইয়া উঠিয়া আসিতেছে। বলরামের বাপ এই শ্রান্ত মানুষগুলির প্রতীক্ষায় পথপার্শ্বে গুড়, ছোলা, কাঁকুড়, জল লইয়া বসিয়া থাকিত, পথিক দেখিলেই আহ্বান করিত,—'এস দেবতা এস, মুখে একটু ঠাণ্ডা জল দাও।' পথিককে বসাইয়া বাতাস দিয়া সুস্থ করিয়া গুড়, ছোলা, জল খাওয়াইয়া তবে সে ছাড়িত।

সে-ও বাপের মত প্রতি বৈশাখ মাসে তৃষ্ণার্ত পথিকের তরে উত্তপ্ত পথ-পার্শ্বে জল লইয়া বসিয়া থাকে। রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের পানে চাহিয়া কত কি ভাবে।

লোকে হাসে। বলে,—'রাবণরাজ স্বর্গের সিঁড়ি তুলছেন।'

দু'এক জন বন্ধুবান্ধব হাসিতে হাসিতে মুখের উপরেই বলে,—'বোশেখ মাসে মিতে আমাদের ধার্মিক হয়ে ওঠে, তা পুণ্যির কাজ বটে।'

বলরাম চটে না, কিন্তু বেশ গম্ভীর ভাবে বলে,—'বাবা কি বলতো জানিস্, বলতো—বলরাম, এই আগুনে পুড়তে পুড়তে যারা বের হয়রে তাদের বাইরের জ্বালাটাই দেখা যায়, কিন্তু বুকের কি পেটের যে-আগুনের জ্বালায় তারা এই আগুনের মধ্যে বেরোয় তার কথা একবার ভাব দেখি।'

বন্ধুরা সায় দিয়া কহে,—'তা বটে, শাস্ত্রেও তাই বলে অক্ষয় পুণ্যি বৈশাখে জলদানে।'

বলরাম কহে,—'সে একশো বার, যত পাপই করি এই জল-দানেই আমার মুছে যাচ্ছে। যদি অবিশ্যি পাপ পুণ্যি সংসারে থাকে। না থাকে তাই বা কি, বাবার কীর্তি এ আমাকে করতেই হবে। আর তোরা ত দেখিস্ নি,—বোশেখের রোদে মাটি যখন পোড়ে তখন মাটির বুক থেকে মা ধরণী যেন তেষ্টায় হা হা করে—শুনেছিস সোঁ সোঁ একটা শব্দ?'

একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার সে কহে,—'আমার তখন মনে হয় কি জানিস, যে, ভগীরথের মত তপস্যায় মাটির বুকে আকাশ থেকে যদি গঙ্গা ঝরাতে পারি।'

এই জলদানের সুবিধাটা বলরামের খুব বড় রকমের হইয়াছে। দুইটা পাকা রাস্তার মোহড়া আগলাইয়া তাহার বাড়ী, আঙিনায় বড় তেঁতুল গাছটার ছায়ায় বসিয়া সে এবার সন্ধ্যা পর্যন্ত জল দান করে। শুধু তাই নয় ওই সুবিধায় সে এবার জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত জল-দান চালাইয়া গেল। রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের বুকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত—প্রখর রৌদ্রে ক্ষীণ তৃণদলের মধ্যে একটা সোঁ সোঁ শব্দ, তৃণদলগুলির রস শুকাইয়া মরিয়া যাইতেছে, বলরামের মনে হইত—এত জলও যদি ভগবান চোখে দিতেন যে মাটির বুকখানা ভিজাইয়া দেওয়া যাইত!

এলোকেশী পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার পিঠ চাটিল, বলরাম একমুঠা ছোলা তাহার মুখে ধরিয়া কহিল,—'বল দেখি মা এলোকেশী, জল কবে হবে?'

এলোকেশী সাদরে বলরামের মুখটা চাটিয়া দিল।

সন্ধ্যার দিকে আবার ভারে ভারে জল, বাগানের প্রতি গাছটির চারা ভরিয়া জল দেওয়া চাই—প্রতি গাছ এমন কি আঙিনার কোলের বিবর্ণ দূর্বাদলগুলিতে পর্যন্ত জলধারা ঢালিয়া দিত। জল দিতে দিতে আপন মনেই কহিত—'আ-হা-হা—খা-খা, তেষ্টায় ত' তোদেরও ছাতি ফেটে যায়!'

চাটুজ্জে দশজনকে আশ্বাস দিতেন,—'দেখবি দেখবি, ফলবে, ফলবে। কথায় কি আছে জানিস্? কথায় আছে—যখন তখন করে পাপ সময় হলে ফলে পাপ, পাপ ছাড়ে না আপন বাপ। তা এ ত আমার বলরাম দাস!'

সেই পাপ ফলিবার সময় হইয়াছিল, না মঘার আঘাত কিম্বা এই স্পর্শের পাকচক্র কে জানে—বলরামের দেহের আকৃতি সহসা কেমন বিকৃত হইয়া উঠিল। নাক কান কেমন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল, সর্বাঙ্গে চাকা চাকা তামাটে তামাটে দাগ।

বলরাম দাগগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে— আয়নাতে মুখ দেখে, নাক কান নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে,—হতাশায় বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। নীরশ কর্কশ যে চোখে এতদিন শুধু উগ্রতার রক্ত খেলা করিয়াছে সেই চোখ দুটি কানায় কানায় জলে ভরিয়া উঠে।

লোকে কহিল,—'এ জন্মের পাপ এই জন্মেই ফলে গেল ; বাবা, ধর্মের সূক্ষ্ম গতি এড়াবার কি জো আছে ?'

ধর্মের গতি হয়তো অতি সূক্ষ্ম, ধর্মের ধাতার হয়তো তিল প্রমাণ অন্যায় সহ্য হয় না, সবই হয়ত ঠিক, কিন্তু যে পাপে বলরামের এত বড় সাজা হইয়া গেল, সে পাপটা বলরামের নয় এটাও সঠিক ; সে পাপ বলরামের বাপের মায়ের। আত্মজকে জীবন ও রক্তদানের সময় সে পাপের বিষ তাহারা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে, এ আমরা জানি।

হয়ত বলরামের পূর্বজন্মের পাপ। কিম্বা হয়ত দেবতা ব্রাহ্মণের অভিশাপই উত্তাপে পাপের সুপ্ত বীজকে উপ্ত করিয়া দিল—

যাই হৌক, বিদ্রোহী পাহাড়ের মাথায় বজ্রাঘাত হইয়া গেল।

রোগের চেয়ে অসহ্য এখন কথার জ্বালা। লোকে এখন মুখের উপরই হাসিয়া নানা কথা কয়। সেদিন ভটচাজ দোকানের সম্মুখেই বলিয়া বসিল, অবশ্য ভদ্রতা করিয়া পিছন ফিরিয়া—

'হবে না, ফলবে না, ব্রহ্মবাক্য এ কি মিথ্যে হয় ? শক্তির দম্ভে দেবতা ব্রাহ্মণ রাজা কাউকে মেনেছে ? তার ওপর বৈষ্ণবের ছেলে —মদ মাংস খাওয়া, গো-হত্যে পর্যন্ত !'

স্বভাব যায় না ম'লে, বলরাম ত বাঁচিয়াই ছিল ; সে দুর্নিবার ক্রোধে গর্জিয়া উঠিল,—'বেরো হারামজাদা বামুন, বেরো, নইলে বলরাম দাস এখনও তোর মত সাতটা বামুনকে নিকেশ করবার ক্ষমতা ধরে।'

রোগবিকৃত চোখমুখ ক্রোধের বিকৃতিতে বীভৎস ভীষণ হইয়া উঠিল। সে মূর্তি দেখিয়া প্রেতেরও বোধ করি শঙ্কা লাগে। ভট্‌চাজ কাঁপিয়া উঠিয়া ঘন ঘন পা ফেলিতে সুরু করিলেন, কিন্তু মুখে হটিলেন না, কহিলেন,—'হক্ কথা ব'লব তা'—তা' ভয় কিসের রে বাপু, হক্ কথা—'

হক্ কথার শেষ কথাটা বলরাম আর শুনিতে পাইল না, ভটচাজ মহাশয় তখন কণ্ঠস্বরের গোচর-সীমা পার হইয়া গেছেন।

বলরাম দাওয়ার উপর বসিয়া এক দৃষ্টে সম্মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গিয়াছে—ঠোঁট দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে কি তাহার মনে হইল কে জানে—তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া পাশের পরিচ্ছন্ন স্থানটিতে বাঁধা এলোকেশীর পায়ে সে লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এলোকেশীর পায়ের ক্লেদ ধূলা সর্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে তাহার মুখটি ধরিয়া কহিল—

'দে মা দে, তুই আমায় ভাল ক'রে দে,—তোকে মেরেই আমার এ পাপ মা, এ প্রায়শ্চিত্তি—।'

এলোকেশী পরম স্নেহভরে বলরামের রোগগ্রস্ত অঙ্গখানি লেহন করিতে করিতে শান্ত কালো চোখের দৃষ্টি দিয়া নিবিড় একটী সান্ত্বনা দিল।

বলরাম প্রত্যাশা করিল রাত্রির মধ্যে তাহার দিব্য দেহ হইয়া যাইবে—এলোকেশীর কৃপা সে লাভ করিয়াছে। উষার স্বচ্ছতারও

আগে সেদিন উঠিল। তখনও ভাল করিয়া দেখা যায় না, দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া চায়। আলো ধীরে ধীরে বিকশিত হয়—বলরাম ভাবে দৃষ্টির ভ্রম হয়ত!

সোণার বর্ণ আলোয় ধরণী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হতাশায় বলরামের বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল—সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সেই ক্ষত, সেই বিকৃতি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তবু আশার শেষ হয় না—নিত্য প্রভাতে সে একটি পরম আশা লইয়া শয্যাত্যাগ করে—

নিত্যই সেই নিরাশা—সোণার বর্ণ আলোয় কুৎসিত ক্ষতগুলা অতি বীভৎস মনে হয়। দিন দিন তাহার পরিধি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সে বৎসরের বর্ষাটা গেল, অনাবৃষ্টির বর্ষা—তার উপর গোটা আশ্বিনটায় এক ফোঁটা বর্ষণ হইল না।

মাঠের ফসল অকালে বিবর্ণ হইয়া ঘাসের মত মাঠেই মিলাইয়া গেল। ফাগুণের শেষ না হইতেই পুকুর বিলের জল হইয়া উঠিল ঘোলা। সমস্ত ধরণীর মধু বসন্তেই হইয়া উঠিল রুক্ষ—মদন যেন রুদ্র-দেবতার রোষবহ্নিতে অকালে ভস্ম হইয়া গেল—ফুল কলিতে শুকাইল—ফল মুকুলেই ঝরিয়া গেল; ধ্যানমগ্ন রুদ্র বিপুল রোষে যেন প্রলয়তাণ্ডবে নাচিয়া উঠিলেন।

প্রভাত হইতে না হইতেই দ্বাদশ সূর্যের উদয়—আকাশের নীলিমা হইয়া উঠিয়াছে রুক্ষ বিবর্ণ। সমস্ত সৃষ্টি যেন অবিরত বিপুল তৃষ্ণায় হা-হা করিয়া চায়—জল—জল—জল!

বিশ্ব-প্রকৃতির পানে চাহিতে চোখের মণিতারা সশঙ্ক স্তিমিত হইয়া আসে—বায়ুস্তরের রুক্ষতায় চোখে জ্বালা ধরে, জল আসে!

বলরামের বাড়ীর ধারে ছোট একটি পুষ্করিণী। তার জল শুকাইয়া গেছে, শুষ্ক পুষ্করিণীর গর্ভে ছোট একটি ইঁদারা কাটিয়া বলরাম জলের সংস্থান করিয়াছে, কিন্তু সে নামেই জল—যেমন পঙ্কিল তেমনি দুর্গন্ধ।

চৈত্র-সংক্রান্তির আগের দিন বলরাম গাড়ী জুড়িয়া এক ক্রোশ দূর নদী হইতে টিন ভর্তি করিয়া নির্মল জল লইয়া আসিল।

কাল সকাল হইতেই জলদানব্রত আরম্ভ।

সন্ধ্যায় সে গুড় বাহির করিল, ছোলা ভিজাইল, চাকা চাকা করিয়া কাঁকুড়, কচি আম কাটিয়া থরে থরে সাজাইয়া রাখিল।

প্রভাত না হইতে সে উঠিয়া স্নান সারিয়া আঙিনার বৃক্ষতলটিতে জল গুড় ছোলার নৈবেদ্য সাজাইয়া পথিক-দেবতার প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল।

বেলার সঙ্গে সঙ্গে এক সূর্য শত সূর্য হইয়া উঠে—রৌদ্রের প্রখরতায় সর্বাঙ্গ যেন ঝলসিয়া যায়; বলরামের রোগজীর্ণ চর্মে সে এক অসহ্য প্রদাহ—কে যেন আগুন বাঁটিয়া সর্বাঙ্গ মাখাইয়া দিয়াছে, বুকের ভিতরটা পর্যন্ত পুড়িয়া যায়।

সমস্ত দেহটায় কাপড় জড়াইয়া বলরাম চোখ দুটি শুধু বাহির করিয়া বসিয়া রহিল।

ওই দূরে সম্মুখের কম্পমান রৌদ্রধারার মধ্য দিয়া কি একটী কালো রেখার মত নড়ে চড়ে না? রেখাটী আগাইয়া আসে, দূরত্ব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মায়া যেন কায়া গ্রহণ করে, রেখাটি মানুষ হইয়া দাঁড়ায়।

বলরাম পরম আগ্রহে পিতলের রেকাবীতে গুড়, ছোলা, কাঁকুড় ও কচি আমের কুচিতে নৈবেদ্য সাজাইতে বসে।

'জল,—একটু জল দিতে পার বাবা—'

ক্ষীণ শুষ্ক স্বর।

শুষ্ক কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া তৃষ্ণার্ত প্রাণ তাহার যেন বহুদূর হইতে জল চাহিল। বলরাম পরম আগ্রহে পায়ের কাপড় টানিয়া সামলাইয়া লইয়া কহিল,—'বসুন, বসুন দেবতা, একটু ঠাণ্ডা হোন্, বসুন—'

লোকটি এক দৃষ্টিতে বলরামের পানে চাহিয়া রহিল।

বলরাম আবার অনুরোধ করিল,—'বসুন আপনি, আমি একটু বাতাস করি, তারপর—'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে বলরাম মধ্যপথেই নির্বাক হইয়া গেল; পথিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—

'নাঃ, আমায় বহুদূর যেতে হবে।'

পথিক পা বাড়াইল। বলরাম ব্যাকুলভাবে কহিল,—'তবে জল খেয়ে যান; আপনার ভেতর যে শুকিয়ে গেল—এই—এই যে জল—'

বলরাম এক হাতে জল অপর হাতে নৈবেদ্যের থালা তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল। পথিক আর একবার বলরামের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার হাত ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কহিল,—'না--না—তেষ্টা আমার পায় নি—'

এমন সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যানে গোঁয়ার বলরামের রৌদ্র-দগ্ধ চিত্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ রূঢ় ভাবে কহিল,—'আমার কি অপরাধ হল, বাবা?'

পথিক উত্তর দিল না। বলরাম আবার তেমনি রূঢ় ভাবেই ডাকিল,—'বাবা!'

পথিক চলিতে চলিতেই আবার কহিল,—'অপরাধ আর কার বলব বল বাবা, অপরাধ তোমার অদৃষ্টের। নিজের অঙ্গের পানে চেয়ে দেখ না। কুষ্ঠ রোগীর হাতের জল কেমন ক'রে খাই বল?'

উপকরণের থালা জলের গ্লাস ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া মাটীর উপর আপনি খসিয়া পড়িয়া গেল, বলরামের সর্ব অঙ্গ যেন ক্ষণেকের তরে পঙ্গু অসাড় হইয়া গেল। তার পর সহসা সজাগ হইয়া লাথির পর লাথি মারিয়া জল উপচার সমস্ত মাটির বুকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

তৃষ্ণার্ত মাটি চোঁ চোঁ করিয়া মুহূর্তে টিনভর্তি জলটা শুষিয়া লইল। এলোকেশী ছুটিয়া আসিয়া ছড়ান উপকরণ গুলি কুড়াইয়া কুড়াইয়া খাইতে লাগিল। তাহাদের পানে চাহিয়া বলরাম আপন মনে কহিল—

'মাটীকে জল দেব, গাইকে জল দেব, পশুপক্ষীকে জল দেব আমি।'

মানুষের উপর ক্রোধে নিজের উপর ঘৃণায় বলরাম যেন পাগল হইয়া গেল। দুরন্ত ক্রোধে সমস্ত দিনটা আহার পর্যন্ত করিল না; সন্ধ্যায় দড়ির খাটিয়াটা মুক্ত আঙিনায় মুক্ত আকাশের তলে বিছাইয়া শুইয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের পানে চাহিয়া সে কি ভাবিতেছিল। এলোকেশী মাথার গোড়ায় শুইয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন জুড়িয়া দিয়াছে।

বিপর্যস্ত মস্তিষ্কে উন্মত্ত চিন্তা অসম্ভব কল্পনা খেলা করে। এক এক সময় ইচ্ছা করে আপনার অঙ্গের সমস্ত ব্যাধি সে যদি এই সৃষ্টিময় ছড়াইয়া দিতে পারে, সমস্ত সৃষ্টি যদি এই বিষে পঙ্গু জর্জর হইয়া যায়!

আবার মনে হয়, সে যদি পৃথিবীর বুকের সমস্ত জলটুকু নিঃশেষে হরণ করিয়া লইতে পারিত, সমস্ত দুনিয়া তাহার ঘরে আসিয়া করযোড়ে জল ভিক্ষা করিত! সে যদি ব্রহ্মার মত নবগঙ্গার সৃষ্টি করিতে পারিত!—এমনি রাশি রাশি অসম্ভব কল্পনা, উন্মত্ত

চিন্তা! তখন বোধ হয় মধ্যরাত্রি, সপ্তর্ষি মণ্ডল পাক খাইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, বলরাম সহসা খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসিল। শিয়র হইতে দেশলাই লইয়া আলো জ্বালিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের কোণ হইতে শাবলটা লইয়া ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া বাহির করিল—দুইটা পিতলের ঘটি—টাকায় পরিপূর্ণ! ঘটি হইতে টাকার রাশি মাটীর উপর ঢালিয়া জ্বল্‌জ্বল্‌ দৃষ্টিতে সেই অর্থস্তূপের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে বসিল।

পরদিন সকালে গ্রামে গ্রামে ঢুলি ঢোল দিয়া ফিরিল—'মজুর চাই—মজুর, বলরাম দাস পুকুর কাটাবে, মজুর চাই—!'

মাটীর বুক ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া চারিটা দিক মাটীর পাহাড় গড়িয়া তুলিল, তাহার মধ্যে গহ্বরের মত গভীর সম-চতুষ্কোণ পুকুর।

কিন্তু কোথায় জল?

পাতালের ভোগবতীর ধারাও শুকাইয়া গেছে!

লোকে কহিল,—'বলরামের পাপে।'

বলরাম কাঁদিল—অফুরন্ত কান্না। কিন্তু অশ্রুজলে সে বিশাল গহ্বরের একটী বিন্দু পরিমিত স্থানও সিক্ত পঙ্কিল হইয়া উঠিল না।

সন্ধ্যার মুখে সেদিন চাটুজ্জে গ্রামান্তর হইতে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে কয়জন লোক, বলরামের দুয়ারের সম্মুখে হঠাৎ চাটুজ্জে মহাশয় দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন,—'বলরাম!'

এক ছিলিম তামাকের বড় প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দুয়ার বন্ধ, কেহ কোথাও নাই, চাটুজ্জে ক্ষুণ্ণ মনে চলিতে চলিতে শুষ্ক পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া সাথীদিগকে কহিলেন,

—'বেটা কুঠের কীর্তি দেখ। এক পুকুর কাটিয়ে বসল; তাই যদি গ্রহ শান্তি-টান্তি করাতো তা হ'লে হয়ত রোগ সারত। তা না এক পুকুর। আরে বাপু কুঠের পুকুরে যদি জল হ'ত তবে আর ভাবনা কি? ধর্ম এখনও একপদ আছে। দেখো তোমরা, এ পুকুরে জল হবে না। যদি হয় তবে ঘোলা—পশু পক্ষীতেও মুখ দেবে না।'

তারপর চলিতে চলিতে পশ্চিম পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া আসিয়া পড়িয়া আবার দাঁড়াইয়া গেলেন। স্তূপীকৃত মাটীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—'কিন্তু কলা আর তরকারী যা একচোট হবে! বুঝেছ কি না, ও ভূতে খেতে পারবে না। তা শালা কি কাউকে একটা দেবে? পুকুরের দুনো খরচ ও এতে তুলবে দেখো।'

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, ঘরের কড়িতে দড়ি ঝুলাইয়া বলরাম গলায় ফাঁস দিয়া ঝুলিতেছে—

বীভৎস বিকৃত মুখ বাঁকিয়া চুরিয়া আরও বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুটী ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়াছে কিন্তু সে চোখ আজ আর সজল নয়। চোখের জল আজ তাহার শুকাইয়াছে। শুধু এলোকেশী পরম স্নেহে তার দেহখানি চাটিত। বোধ করি তাহাকেই ডাকিতেছিল।

এ যদি নিয়তির পরিহাস হয় তবে বড় নিষ্ঠুর পরিহাস! সেই রাত্রেই অজস্র বর্ষণে ধরণী শীতলা হইয়া গেল; বহুদিনের দগ্ধ ধরার বুকে জল জমিল না। কিন্তু প্রকৃতি সরসা হইয়া উঠিল।

সব চেয়ে বড় পরিহাস—পাথরে কাঁকরে ভরা প্রান্তরের বুক ঝরিয়া বলরামের পুকুরে জল দেখা দিল—দিন দিন সে জল বাড়ে। কাঁকর পাথরের বুক-ঝরা কাঁচবরণ জল।
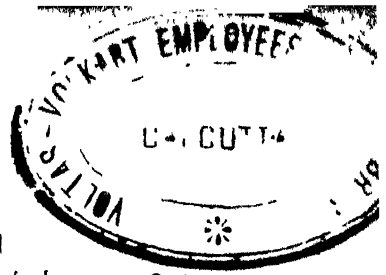
বর্ষণের পর আবার বর্ষণ, আবার বর্ষণ।

দীঘির বুক জলে জলে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে। সে নির্মল জলধারায় হিল্লোল উঠে।

মাঠের পশু তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া আকণ্ঠ পুরিয়া জল পান করে, তৃষ্ণার্ত পথিক অঞ্জলি ভরিয়া জলপানে তৃষ্ণা জুড়ায়, পল্লীবধূরা দলে দলে নির্জন প্রান্তরে কলসী লইয়া সে জলে হিল্লোল তোলে, চঞ্চল ছেলের দল কলরোলে সে জলে ঝাঁপ খাইয়া সাঁতার কাটে। চাটুজ্জে স্নানান্তে আহ্নিক করিতে করিতে ছেলেদের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া কহেন,—'লঘু গুরু মানা-মানি নেইরে বাপু, তোরা হ'লি কি ? রাধে রাধে।'

সেদিনও ওই অত্যাচারে আপনার গাড়ুটী জলে ভর্তি করিয়া চাটুজ্জে গামছা খানি মাথায় দিয়া উঠিয়া পড়েন। কিন্তু ঘাটের পথ জুড়িয়া একটা খোঁড়া বাছুর, চাটুজ্জে সেটাকে তাড়ান—'হেট্—হেট্।'

এ সেই এলোকেশী। এলোকেশী আবার বাবুদের ঘরে গিয়াছে। বাবুদের ঘরের গরুর মতই রূপ হইয়াছে ; তবু এখানে আসে, খোলা পাইলেই পলাইয়া আসে।

এলোকেশী নড়ে না, অসহিষ্ণু চাটুজ্জে জলপানতৃপ্ত একটী পথিককে কহেন,—'দাও ত হে বাছুরটাকে ঠেলে সরিয়ে।'

বাছুরটাকে সরাইয়া পথ করিয়া দিয়া পথিক কহে,—'বড় চমৎকার পুকুরটী ঠাকুরমশায়, পবিত্র জল !'

চাটুজ্জে কহিলেন,—'পাথর খেলে এ জলে হজম হয়ে যায় বাবা, এ জল ছাড়া আমি খাইনে। শুধু আমি কেন, চাকলার লোক এই জল খায়। এই একটী গাড়ু নিয়ে চল্লাম। সারাদিন ঢুক্ ঢুক্ করে খাব। দাও ত আর একটু বাছুরটাকে সরিয়ে।'

তাড়নায় এলোকেশী খোঁড়াইয়া চলিতে চলিতে মুখ তুলিয়া চারিদিকে চায়, শেষে বলরামের ভাঙা ভিটার ধারে গিয়া ভাষাহীন পশু রব করিয়া উঠে।

সে রবের সুরটি বোঝা যায়—ব্যগ্র আহ্বানের সুর। কাহাকে যেন ডাকে সে।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর আবার সে ডাকে।

॥ মানুষের মন ॥

বিস্ফোরণের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত।

বারুদ দিয়ে তৈরী পলতেতে আগুন ধরালে সে আগুন যেমন বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলে বিস্ফোরকের মুখের দিকে, ঠিক তেমনি ভাবেই স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তার সুর চরম সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

ভবেন্দ্র বললে,—হ্যাঁ তোমার নাম সার্থক, তুমি সুভাষিণী বটে। এত বিষ তোমার কথায়! সম্ভবত সমুদ্র মন্থনের শেষ কল্লোল—যে কল্লোলের সঙ্গে হলাহল উঠেছিল, তারই ধ্বনি ভগবান তোমার কণ্ঠে দিয়েছিলেন! ওই থেকেই তৈরী হয়েছে তোমার ভাষা।

শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ ভবেন্দ্র; হুঙ্কার দিল না, স্থূল ভাবে আঘাত করলে না, কিন্তু সুভাষিণীর অন্তর ভেদ করে সব যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিলে। ছেলেবেলায় সুভাষিণী গল্প শুনেছিল এক সিদ্ধ অস্ত্রনির্মাতার; সে তলোয়ার তৈরী করত— বড় বড় গাছের কাণ্ড যে তলোয়ারের কোপে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত কিন্তু পড়ে যেত না। যেমনকার গাছ তেমনি দাঁড়িয়েই থাকত, শুধু শুকিয়ে যেত তার পত্রপল্লব—ঝরে পড়ত ফুল-ফল। এ যেন তেমনি আঘাত। সুভাষিণী পল্লীগ্রামের বড়লোকের ঘরের মেয়ে, শিক্ষিতা নয়, কিন্তু মুখরা, প্রচণ্ড মুখরা; স্বামীর কথার সূত্র অনুসরণ ক'রে পৌরাণিক উপমা সংগ্রহ করেই সে উত্তর দিলে,—আর তোমার? তোমার কথার পরতে পরতে অমৃত! সুধা! সুধা ঝরে পড়ছে। ব্রজের বাঁশীর মধুর সুরের ধ্বনি তোমার কণ্ঠে ভগবান দিয়েছেন—না?

এর পরই সে ফেটে পড়ল, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল,—তুমি বল না মন্দ কথা ?

শান্ত স্বরে ভবেন বললে,—না। মন্দ কথা, অন্যায় কথা, কুৎসিত কথা আমি বলি না। আমি বলি কঠোর সত্য কথা। তুমি তা সহ্য করতে পার না। হাত-পা থাকলেই মানুষ হয় না সুভাষিণী; আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির পরিবর্তনের দরকার হয়। সূর্যের আলোকে সহ্য করতে পারে না বলে পশু দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে জঙ্গলের অন্ধকারে—গুহার অন্ধকারে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিতে যারা পশুত্বকে ছাড়াতে পারে না তারা সত্যকে ভয় করে সূর্যের আলোর মত। সূর্যের আলো শুধু তো সাদাই নয়, তার উত্তাপ আছে, কঠোর উত্তাপ।

—তার মানে আমি পশু, আমি জানোয়ার ?

—যে চীৎকারটা তুমি করছ সুভাষিণী, সে কি শুনতে পাচ্ছ না ? বুঝতে পারছ না জানোয়ারের গর্জনের সঙ্গে কতখানি মিল রয়েছে ? একটু এগিয়ে যাও ওই আয়নাটার দিকে—নিজের মুখের চেহারা দেখ, তোমার পরিষ্কার দাঁতের ডগায় কি ধার ঝিলিক মারছে দেখ। তা হ'লে বুঝতে পারবে!

সুভাষিণী শরবিদ্ধ পশুর মত যন্ত্রণায় অধীর হয়ে নিজের আহত স্থানটিকে কামড়ে ধরতে চাইলে; ভাবলে, ওইখানেই আছে তার আঘাতকারী শত্রু। সে নিষ্ঠুর ক্রোধে দেওয়ালের গায়ে নিজের মাথা ঠুকে বলে উঠল,—মরুক মরুক, জানোয়ার মরুক; তোমার শিকার করা সার্থক হোক।

ভবেন্দ্র দাঁড়িয়ে রইল, এক পা এগিয়ে গেল না তাকে ধরতে, বা একটি কথা বললে না সুভাষিণীকে ক্ষান্ত হবার জন্য। সে জানে সুভাষিণী এ ভাবে মাথা ঠুকে মরতে পারে না। জীবনে স্বার্থই যার সর্বস্ব, সামান্য এতটুকু পার্থিব বস্তু যে ত্যাগ করতে

পারে না, সে জীবন ত্যাগ করবে কি করে? কয়েক মুহূর্ত পরেই ভবেন্দ্রের অনুমান সত্য হ'ল, সুভাষিণী দেওয়ালের কাছ থেকে প্রায় ছুটে এগিয়ে এল ভবেন্দ্রের দিকে। এবার ভবেন্দ্র শিউরে উঠল। সুভাষিণীর কপাল ফুলে উঠেছে, খানিকটা ছেঁচে গিয়েছে, রক্ত বেরিয়ে আসছে সেই ক্ষতস্থান থেকে। ভবেন বলে উঠল,—সুভাষিণী!

গ্রাহ্য করলে না সুভাষিণী, সে শেষ আক্রমণ করবার জন্য দাঁত নখ বের ক'রে ছুটে এসেছে, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবে সে ভবেন্দ্রকে। এবার সে উলঙ্গ আক্রমণ করলে, বললে—আমি জানোয়ার, তুমি দেবতা! তুমি অক্ষম, তুমি অপদার্থ, উপার্জন করবার তোমার ক্ষমতা নেই, তাই তুমি পরোপকার আর দেশোদ্ধারের ভাণ করে মাথা উঁচু করে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াও, জেল খাট। তুমি স্ত্রীর টাকা দান করে দাতা সাজ। অর্থ তোমার নেই, তাই তুমি নিঃস্বার্থ। লজ্জা করে না তোমার, আমার বাপের দেওয়া টাকা এই ভাবে খরচ করতে? তোমার বাপের ভিটে দেনার দায়ে নীলামে চড়ে, আমার বাপের দেওয়া টাকায় দেনা শোধ করে সে ভিটে বাঁচে। তুমি যাও সত্যাগ্রহ করতে! একবারও মনে ভেবে দেখ না, যুবতী স্ত্রী কি খাবে, কি পরবে, কে দেখবে তাকে! তার ওপর তুমি পঞ্চাশ-পঞ্চান্নটা ভিখিরী জুটিয়ে এনেছ, তাদের খেতে দেবে ব'লে। তাতেই আমি আপত্তি করেছি, সেইজন্য আমি জানোয়ার। নির্লজ্জ কোথাকার, বেহায়া কোথাকার! ভিখিরী যে সেও ভিক্ষে করে স্ত্রীকে খেতে-পরতে দেয়, চোর চুরি ক'রে স্ত্রীকে প্রতিপালন করে।

ভবেন্দ্র মাথা হেঁট করে পিছন ফিরলে। দরজার দিকে পা বাড়ালে।

পিছন থেকে তার জামার পিছনটা চেপে ধরলে সুভাষিণী।

—কোথায় যাবে তুমি? উত্তর দিয়ে যাও আমার কথার।

ভবেন্দ্র বললে,—জীবনের সাধ আমার মিটে গেল সুভাষিণী। তোমায় মুক্তি দিয়ে আমিও মুক্তি নিতে চল্লাম। ছেড়ে দাও আমাকে।

নিষ্ঠুর বিদ্রূপে ব্যঙ্গ করলে সুভাষিণী,—ছেড়ে দাও আমাকে! আমাকে মুক্তি দিতে যাচ্ছেন, মুক্তপুরুষ, সাধুপুরুষ! দাঁত দাঁত চেপে কঠিন স্বরে সে আবার বললে,—আমার দেনা শোধ কর তুমি। আজ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা পাব। যখন যা দিয়েছি—পাই-পয়সা আমি লিখে রেখেছি।

ভবেন্দ্র বললে,—জন্মান্তর। জন্মান্তরে সুদ শুদ্ধ শোধ করবো।

বলেই সে জোর করে জামার খুঁট্‌টা ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুভাষিণীও কঠিন ক্রোধে ছুটে নেমে এল নীচে। কিন্তু ভবেন্দ্র দ্রুততর গতিতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল উঠানে—তারপর উপরে উঠে গেল, ঘরে খিল দিয়ে খুঁজতে লাগল একগাছা দড়ি, একটা টেবিল, একটা টুল; উপরের দিয়ে চেয়ে দেখলে, খড়ে ছাওয়া কোঠা ঘর, তালের কড়িগুলো অনেক উঁচুতে। অনেক উঁচু! তা-হোক! হোক অনেক উঁচু, খাটের উপরে টেবিল, তার উপরে চেয়ার, তার উপরে টুল,—নাগাল পাওয়া যাবেই! দড়ি পাওয়া যাবে বাইরের ঘরের পূব দিকের দেয়ালের কাছে যে কাঠের সিন্দুকটা আছে তার ভিতর। চাষের জিনিসের মধ্যে আছে লাঙলের দড়ি। হাতে পাকানো শণের মজবুত দড়ি—অন্তত হাত আষ্টেক লম্বা!

টেবিলটা টানলে সে।

ঠোঁটে তার অতি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গহাস্য ফুটে উঠেছে। যত ধারাল, তত বাঁকা। ঠোঁট দুটি সত্যসত্যই গুণ দেওয়া ধনুকের মত বেঁকে গেছে।

লোকে তাকে বলে ভাগ্যবতী। স্বামীভাগ্যে ভাগ্যবতী! রূপবান, গুণবান, মহৎ, পণ্ডিতলোক ভবেন্দ্র! লোকে বলে এ গ্রাম বহু তপস্যা করে তাকে পেয়েছে।

গুণবান! মহৎ! পণ্ডিত!

তার বাবা এবং মাও এই ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে তাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন। গ্রামেরই ছেলে ভবেন্দ্র, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তার বাবা, লোকে বলত নির্লোভ মানুষ। দেহের গৌরবর্ণের স্নিগ্ধতার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে তারা বলত, বর্ণচ্ছটা এমন হয় না—এ হল পুণ্যচ্ছটা। একটি শিশু ছেলে আর একটি শিশু মেয়ে রেখে মারা যান; মা ছিলেন বিনীতা, মধুর স্বভাবের মেয়ে—তিনিই মানুষ করেছিলেন ছেলেকে মেয়েকে। মেয়ের বিবাহ দিতে ব্রহ্মত্র জমিটুকু বিক্রী করেছিলেন। ভিটেটুকু বন্ধক দিয়েছিলেন। যজমানদের সাহায্যে চলত সংসার। দীপ্তিমান ছেলেটি, স্থানীয় স্কুলে ছিল ফ্রি। ইস্কুলের নাম উজ্জ্বল করবে—ভরসা করতেন শিক্ষকেরা।

সুভাষিণীর ঠোঁট দুটি আরো বেঁকে গেল। যেন ছিলায় ধরে টান দিলে ধনুকে। দীপ্তি! ঝকমকানি দেখলেই মানুষ তাতে দেয় মহামূল্য। গিল্‌টিকে ভুল করে সোনা বলে, কাচকে ভ্রম করে হীরা বলে! বাবাও তার সেই ভ্রম করেছিলেন। একদিন রেল স্টেশনে তিনি নামছিলেন ট্রেন থেকে। দেখলেন, লাইনের ডি-টি-এস্ একজন ইংরেজের সঙ্গে মাথা উঁচু করে নির্ভয়ে বাদ-প্রতিবাদ করছে ভবেন্দ্র। দীপ্ত গৌরবর্ণ কিশোর যেন অকম্পিত

শিখার মত জ্বলছে। বোর্ডিংয়ের একটি ছেলে স্টেশন কম্পাউণ্ডের গাছ থেকে ফুল পাড়ছিল। সায়েব ছিলেন লাইনের উপর, কেটে-রাখা সেলুনের মধ্যে। ইনস্‌পেকশনে এসেছিলেন। তিনি ছেলেটিকে ডেকে চোর বলে অপমান করেই ক্ষান্ত হননি—তাকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত দেশীয় ছেলেকেই চোরের জাত, নিগারের জাত বলে গাল দিয়েছিলেন। ভবেন্দ্রও ছিল সেখানে, সে নির্ভয়ে সায়েবের গাড়ীর হাতল খুলে গাড়ীতে ঢুকে প্রতিবাদ করেছিল। সুভাষিণীর বাপ ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। তিনি সেদিন না থাকলে হয় তো ভবেন্দ্র সেই দিনই জেলে যেত। ইংরেজ রাজত্ব। খাস ইংরেজ ডি, টি, এস্! সুভাষিণীর বাবা ভবেন্দ্রের সাহস দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেদিন বাড়ী ফিরেই সুভাষিণীর মাকে বলেছিলেন,—ছেলেটিকে জামাই করলে হয় না? সুভাষিণীর মা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন,—ঠাট্টা করছ, না সত্যি বলছো? বড় ভাল ছেলে। আমার সাধ হয়। আমার চোখের সামনে থাকে। তা ছাড়া, কিছু মনে করো না, যে মুখরার বংশ তোমাদের! গাঁয়ে ঘরে গরীবের ছেলে—বিয়ে দিলে সুভাষিণীর আদর হবে।

বাবা বলেছিলেন,—মন্দ বলনি। দেখি, ভেবে দেখি। আমার সাধ বিদ্বান জামাইয়ের। আমার ছেলেরা তো বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখলে না! ও ছেলে লেখাপড়া শিখবে। কি সুভো, বিয়ে করবি ওই ভবেনকে?

সুভাষিণীর বয়স তখন সবে এগারো, সে হেসে পালিয়ে গিয়েছিল। তার ভাল লাগত ভবেনকে। সুভাষিণীর ছোড়দার সঙ্গে পড়ত। ছোড়দা কোন রকমে পাশ করত, ভবেন হ'ত ফার্স্ট। ছোড়দার সঙ্গে সুভাষিণীর ছিল ঝগড়া; ছোড়দা কোন মতেই দেখতে পারত না ভবেনকে, তাই সুভাষিণীর ভাল লাগত তাকে।

শুধু ওই জন্যেই নয়, আরও কিছুর জন্যেও ভাল লাগত। ওই গিল্‌টির ঝকমকানিতে সেও ভুলেছিল। গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ ছেলেটিকে দেখে তারও ভাল লাগত।

যাক্‌—আজ হয়ে যাক সে ভাল-লাগার প্রায়শ্চিত্ত। সে টেবিলটাকে টেনে তুলতে লাগল খাটের উপর। ভারী টেবিল, খাটের উপরে উঠে টেবিলখানাকে টানলে ; কিন্তু ঝোঁক সামলাতে পারলে না, মাথা নিচু করে পড়ে গেল, টেবিলটা উল্‌টে গিয়ে তারই টানে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

ভবেন চলেছিল ট্রেনে। একটা কামরার এক কোণে চোখ বুঁজে সে বসে ছিল। আজ সে মুক্তি পেয়েছে।

যৌবনের প্রারম্ভে একটা নিদারুণ ভ্রান্তির ফলে নাগপাশে জড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে। স্কলারশিপ পেলে ম্যাট্রিকে। সুভাষিণীর বাপ—এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ধনী, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন। ভবেন মনে করলে এ তার বিশ্বজয়ের গৌরব। হায় রে ভ্রান্তি! পল্লীগ্রামের দরিদ্রের সন্তান, বিশ্ব তার কাছে তখন এমনি ছোটই ছিল। এ অঞ্চলের রাজা ; তিনিই ছিলেন তার কাছে পৃথিবীর রাজা। দাম্ভিক ধনী তার কাছে মাথা হেঁট করলেন! তখন সে কি ভেবেছিল—ধনীর ওই কন্যাটির অন্তর এত কদর্য। স্বার্থপর সুভাষিণী ; অহঙ্কৃতা দুর্বিনীতা সুভাষিণী! আশ্চর্য! এতদিন--আজ সাত বৎসর তার সঙ্গে বাস করলে, তবু তার এতটুকু পরিবর্তন হল না! কলকাতায় পড়তে গেল ভবেন। বাইরের পৃথিবী দেখে তার চিত্ত সূর্যালোক-সংকেতে নূতন অঙ্কুরটির মত আকাশের দিকে মাথা ঠেলে উঠতে লাগল। তার বংশ-সম্পদের লোভ নেই। পুরুষানুক্রমে এই সাধনাই তারা ক'রে এসেছে। পণ্ডিতের বংশ, পরমরহস্যের সন্ধানই

ছিল তাদের বংশগত সাধনা। সেই সাধনা নূতন শিক্ষার খাতে পড়ে নূতন মুখে ছুটল। গ্রহণ করল সে গান্ধীজীর আদর্শ। আরম্ভ হল সংঘাত।

সুভাষিণী বলেছিল,—মা গো! এ কি ছিরি করেছ নিজের! হাঁটু পর্যন্ত খাটো মোটা কাপড়, গায়ে একটা আধ বাঁইয়া—এর চেয়ে যে চাষাভূষোর পোশাক ভাল। মাথার চুল কদম-ফুলি করে ছেঁটেছ—আয়নাতে দেখেছ নিজের ছিরি?—ও সব ছাড়।

ভবেন বলেছিল,—না; তোমাকেই বরং ছাড়তে হবে জর্জেট-বেনারসী-পপ্‌লিন্‌।

—কি দায় আমার। কেন ছাড়ব?

—সে হবে না।

—হবে না তোমার কথায়? এ সব তুমি দিয়েছ আমাকে? আমার বাবা আমায় টাকা দিয়ে গেছেন, সেই টাকায় আমি পরি।

এই সুরু। তার পর একটার পর একটা। ভবেনের প্রথম জেল হ'ল হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন নিয়ে। বি, এ পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না। জেল-গেটে আটক বন্দী হল। তারপর গ্রামে এসে কাজ সুরু করলে।

সুভাষিণী বললে,—শেষে তুমি এই করলে! আমার কপালে আগুন ধরিয়ে দিলে? লেখাপড়া ছাড়লে, চাকরি করবে না—গাঁয়ের যত ছোটলোক নিয়ে পাঠশালা, সেবাসমিতি—এ করে শেষে খাবে কি? হাওয়া?

ভবেন বলেছিল,—খাওয়াব তোমাকে আমি, নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু তার জন্যে আমার সঙ্গে খাটতে হবে।

—খেটে খেতে হবে! কাজ নেই সে অন্নে। আমার বাবা আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন, তাতেই আমার চলে যাবে।

ভবেন খেতো মোটা চালের ভাত, দাল, একটা তরকারি। বাড়ীতে সে তার জন্যে স্বতন্ত্র রান্নার ব্যবস্থা করেছিল। সুভাষিণীর সংসারের জন্য ব্যবস্থা ছিল তার রুচিমত। এই নিয়ে অনেক অশান্তি হয়ে গেছে। সুভাষিণীর জেদ—তার রুচি অনুসারে খেতে হবে। ভবেন চলত নিজের রুচি নিয়ে। সে রুচি জোর করে সুভাষিণীর উপর চাপাবার পক্ষপাতী ছিল না সে : সুভাষিণীর সে জেদ ছিল।

তারপর যুদ্ধের প্রারম্ভে মহাত্মাজী সুরু করলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। এ জেলায় সে হল দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী। সেই জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে মাত্র দশ দিন।

দেশে লেগেছে তুর্ভিক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে মড়ক।

সে কয়েক দিন ঘুরে নিজের বাড়ীতেই খুললে সাহায্য-কেন্দ্র। আজকার বিরোধ সেই নিয়ে। সুভাষিণী বললে,—দেব না, ওসব করতে দেব না আমি।

ভবেন বলেছিল,--তোমার কিছু লাগবে না, আমি ভিক্ষে করে সংগ্রহ করব।

—না, লাগবে না! তা হলে তো ওরাই ভিক্ষে করে খেয়ে বাঁচতে পারে। আমি জানি শেষ পর্যন্ত—

—না সুভাষিণী, সে লাগবে না তোমাকে।

সুভাষিণী বলেছিল,—না, তোমার কথায় এতটুকু বিশ্বাস নেই আমার।

স্তম্ভিত হয়েছিল ভবেন,—আমায় তুমি অবিশ্বাস কর?

—করি! সংসারে যারা অক্ষম, তারাই অবিশ্বাসী। দেবতার টাকা, গরুর টাকা তারা ভেঙ্গে ফেলে। আমি তোমার স্ত্রী—আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক তুমি। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের বাড়ীতে যারা সাহায্য-কেন্দ্রের কাজ করছিল

তাদের চীৎকার করে বলতে গিয়েছিল—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও! বাধা দিয়েছিল ভবেন। চাপা গলায় গম্ভীর ভাবে বলেছিল—সুভাষিণী!

সুভাষিণী বলেছিল,—না-না। তোমার চোখ-রাঙানিকে ভয় করি না আমি। নির্গুণ পুরুষের ফণা কুলোর মতই বড় হয়, ফোঁসফোসানিও তেমনি মারাত্মক হয়, কিন্তু বিষ থাকে না।

ভবেন কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আত্মসম্বরণ করে বলেছিল,—হ্যাঁ তোমার নাম সার্থক, তুমি সুভাষিণী বটে!

যাক, আজ মুক্তি পেয়েছে সে। শেষ হয়ে গেল দ্বন্দ্বের। ভগবানকে সে ধন্যবাদ দিলে মনে মনে। এমনি করেই তুমি চরম আঘাত দিয়ে বন্ধনমুক্ত করে দাও, তাই তো তুমি বন্ধনহারী। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল তপ্ত অশ্রুর দুটি ধারা। সে জল সে মুছলে না। গাড়ীটা একেবারে খালি। বেয়াল্লিশ সালের শেষ, কলকাতা-গামী ট্রেন প্রায়-জনশূন্য। কলকাতায় বোমা পড়ছে। অনেকখানি চোখের জল বেরিয়ে যেতে সে খানিকটা সুস্থ হ'ল। মনে মনে নিজেকে বললে, তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নেই কো অবহেলা। এ সত্যি—এ সত্যি। আঘাত দিয়ে তুমি আমাকে মনে করিয়া দিলে—আমি তোমাকে ভুলে ছিলাম। আমার বংশগত সাধনার ধারার মুখে নিজেই দিয়েছিলাম বাঁধ। সে বাঁধ আজ খুলে গেল। সকল কিছুর উপরে তুমি। আমি তোমাকে চাই, তোমার সন্ধানে যাব আমি।

এবার সে বাইরের দিকে চাইলে। হু হু করে ট্রেন চলেছে। রাত্রি হয়ে গেছে। অন্ধকার। এমনি চিন্তানিমগ্ন ছিল সে, কতদূর এসেছে সে খেয়ালও তার নেই। নড়েচড়ে বসলে সে আবার। কলকাতা নয়। সামনের যে-কোন বড় স্টেশনে নেমে পড়বে।

চলবে সে পশ্চিমে। দূর—সুদূর উত্তরে, শান্তিময় হিমালয়—ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান লাভের সিদ্ধ বেদী।

ট্রেন এসে থামল ব্যাণ্ডেলের খানিকটা আগে। চারিদিকে গভীর অন্ধকার। আকাশে গুরু গুরু গুরু গুরু শব্দ উঠছে। প্লেন উড়ছে। সাইরেন হয়েছে। হঠাৎ চকিতে দীপ্তি চমকে উঠল আকাশে। আকাশ আলো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দ হ'ল। কাছেই কোথাও এয়ার রেড আরম্ভ হয়েছে।

মরবে? সে মরবে? এমন সুযোগ! নেমে পড়ল সে গাড়ী থেকে।

চার বৎসর পর।

চরকা-কাটা শেষ ক'রে সুভাষিণী উঠল। ঘড়িতে আটটা বেজে দশ মিনিট। দশ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি দেওয়ালের হুকে ঝোলানো খদ্দরের ঝুলিটা নামিয়ে কাঁধে তুলে বেরিয়ে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ফিরল। জীবনে ব্যস্ততাটা কিছু নয়। ভুল হয়ে যায়। ফিরে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো ভবেন্দ্রের ছবির নীচে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে। ছবিখানি সে অনেক সন্ধান করে সংগ্রহ করেছে জেলা কংগ্রেস-কমিটির সভাপতির কাছ থেকে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের দণ্ডভোগের শেষে জেল থেকে যেদিন ভবেন্দ্র বেরিয়েছিল সেই দিন ছোট ক্যামেরায় ছবিখানি তুলেছিল সভাপতির ছেলে। ছবিখানিকে বড় করে করিয়ে নিয়েছে সে। ছবিতে টাটকা ফুলের মালা ঝুলছে। সকালেই সে মালা গেঁথে পরিয়েছে। প্রণাম করে সে বেরিয়ে পড়ল। সেবা-সমিতিতে যেতে হবে। তারপর মেয়েদের ইস্কুলে। দুপুরে

খাওয়া দাওয়ার পর গ্রামের বয়স্কা মেয়েদের আসর। সন্ধ্যায় নৈশবিদ্যালয়।

সুভাষিণীর প্রচণ্ড পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। আহত অজ্ঞান অবস্থাতেই ভাইয়েরা তাদের বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সে যমে-মানুষে টানাটানি। ছমাস পর সেরে উঠে বসল যেদিন সেদিনই সে বড় বৌদিকে ডেকে বললে,—আমি এইবার ওবাড়ি যাব। রোগের মধ্যেই অনেক কথা তার কানে এসেছে এ বাড়ির। সবই ভবেন্দ্রের এবং তার সমালোচনা। নীরবে সে সব সহ্য করেছে। ভাইরা দিয়েছেন ভবেন্দ্রকে গালাগালি। বউয়েরা দিয়েছেন সুভাষিণীকে দোষ। এর মধ্যে সে শুধু ভেবেছে। শুধুই ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে অনেক অভিমান, অনেক ক্ষোভ, অনেক আত্মগ্লানির সংঘর্ষের মধ্যে তার অনেক ভাঙ্গা-গড়া হয়ে গেল। স্বামীর বাড়ী ফিরে সে আরম্ভ করলে নূতন জীবন। প্রথমেই সে ভাইদের ফিরিয়ে দিলে তার বাপের দেওয়া টাকা। বললে,—আমায় এই দণ্ডের মূল থেকে মুক্তি দাও দাদা। এ হল রক্তমুখী নীলা—যার কাছে থাকে তার ওপর এর প্রভাব ফলবেই।

বড় ভাই বললেন,—সেটা ভাল দেখাবে না সুভাষিণী। তার চেয়ে দানটান কর।

ছোট ভাই—তার ছোড়দা, নিজের অংশটা নিলেন। ইতি-মধ্যেই তার অভাব দেখা দিয়েছে।

সুভাষিণী অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে আরম্ভ করলে স্বামীর ফেলে-যাওয়া কাজ।

ভবেন্দ্রের সন্ধান মিলল না।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি অনেক সন্ধান করেছেন কর্মীদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, সন্ধান মেলে নি। ভাইরা সন্ধান করলে জেলা

আই-বি অফিসারের মারফৎ, জেলে জেলেও খবর করা হল— মিলল না সন্ধান।

সুভাষিণীর কানে একটা কথা মধ্যে মধ্যে বেজে ওঠে— জন্মান্তরে, জন্মান্তরে সুদ শুদ্ধ শোধ করব।

সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে যায় ঘরের কোণে। কাঁদে।

হয় সে নেই, নয় সে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। সুভাষিণী তখন তাকে জেনেও জানে নি, আজ তার কাছে সব স্পষ্ট— প্রত্যক্ষ।

স্কুলের মেয়েরা গান গাইছিল। স্কুল বসার সুরুতেই গান হয়ঃ

'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো—আগুন জ্বালো!'

হঠাৎ সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়াল একখানা প্রকাণ্ড মোটর। কে এল? চঞ্চল হয়ে উঠল মেয়েরা। ভ্রূকুঞ্চিত করে সুভাষিণী বললে,—ভুল হচ্ছে; মন দিয়ে গাও।

গাড়ী থেকে নেমে এল তার ছোড়দা।—সুভি!

মুখ তুলে তাকালে সুভাষিণী।

গাড়ীতে এসেও ছোড়দা হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, —ভবেন এসেছে, সুভি, বাড়ী আয়।

—কে? কে এসেছে? থর থর করে কাঁপতে লাগল সুভাষিণী।

—ভবেন। ভবেন এসেছে। আমাদের ওখানে রে। এই তো তার গাড়ী। মস্ত বড়লোক হয়েছে। এই তো তার গাড়ী, দেখ না কত বড়? তিরিশ হাজার টাকা দাম। স্যুটখানা পরে

আছে—তার দাম কম-সে-কম পাঁচশো। আমরা তো চিনতেই পারি নি।

সুভাষিণীর দেহের কম্পন স্থির হয়ে এল। স্থির দৃষ্টিতে সে ছোড়দার দিকে চেয়ে রইল।

ছোড়দা বলেই গেল—না বলে যেন তার তৃপ্তি নেই, স্বস্তি নেই, মুক্তি নেই; বললে,—বাঁশবেড়েতে যেদিন বম্বিং হয়, সে সময় ব্যাণ্ডেলের ওখানে একজন বড় মিলিটারি অফিসার জিপ্ উলটে পড়েছিল রাস্তার ধারে। ভবেন দেখতে পেয়ে তাকে জিপের তলা থেকে বের ক'রে সেবা ক'রে জ্ঞান ফিরিয়ে স্টেশনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে হাসপাতালে। ব্যস্, আর কি? হা-হা করে হেসে ভবেন বললে—যাচ্ছিলাম সন্ন্যাসী হ'তে। বুঝেছ না; good luck—অফিসার আমাকে সে foolish কর্ম থেকে রক্ষা করলেন। বললেন—Young man, চল আমার সঙ্গে। তারপর মিলিটারী কনট্রাক্ট। একটার পর একটা। লক্ষর পর লক্ষ। সুভাষিণী was my inspiration, বুঝেছ না! Run on—run on, run on—বুঝেছ না—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছি। অবশেষে পরশু—স্বপ্ন দেখলাম সুভাকে। মন চঞ্চল হয়ে উঠল। ভেবেছিলাম কোটী পূরণ না করে ফিরব না। কিন্তু থাকতে পারলাম না। কাল রাত্রে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম, না পুরুক কোটী, বাকি তো কুড়ি লক্ষ—সেটা সুভাকে নিয়ে এসেই পুরিয়ে নেব।

সুভাষিণী চোখ বুজল।

তার মনশ্চক্ষের সম্মুখে পৃথিবীর অন্তরলোক টলছে, কাঁপছে, সেখানে ভূমিকম্প সুরু হয়েছে।

ছোড়দা বললে,—তুই এখন এই সব করছিস শুনে যা হা-হা-হা করে হাসলে! বললে—আরে রাম-রাম, আমার ভূতটা শেষে ওকে পেয়ে বসল? আয়! সুভি!

সুভাষিণী হাত বাড়িয়ে বললে,—আমার হাতটা ধর।

প্রকাণ্ড বড় চকচকে গাড়ী, ত্রিশ হাজার টাকা দাম। দরজাটা খুলতে খুলতে ছোড়দা বললে,—আমি মদ খাই বলে অনেক কথা বলতিস। চল দেখবি, ভবেন একেবারে চুরচুরে হয়ে আছে। সঙ্গে একটা বাক্সবন্দী বিলিতী মদ।

পৃথিবীটা ভেঙ্গে পড়ে গেল—সুভাষিণী চিৎকার করে উঠল—ভূমিকম্প…

সভয়ে হাত ছেড়ে দিলে তার ছোড়দা। সুভি!

সুভাষিণী পড়ে গেল মাটিতে। পরক্ষণেই উঠে ছুটতে সুরু করল। ছুটল নিজের বাড়ীর দিকে।

ছোড়দার কথা শুনে ভবেন হেসে আকুল হ'ল। বললে,—শক্ পেয়েছে। সামলাতে দাও। আমি ততক্ষণ স্নানটা সেরে নিই! কাল রাত্রে পানের মাত্রা বেশি হয়েছিল। মাথা reel করছে।

সুভাষিণী ছুটে এসে উপরে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলে।

চালের কাঠের দিকে তাকালে।

ধীরে ধীরে খাটের উপর তুললে টেবিলটা।

তার ওপর চাপালে চেয়ার—তার উপরে টুল।

অকম্পিত হাতে খুলে নিলে সেই লাঙলের দড়িটা—সেটা ওই ঘরেই লম্বা করে টাঙানো ছিল কাপড় রাখার জন্য।

ছবির দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে বললে,—শেষে প্রেতমূর্তি ধরে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ!

তারপর সহাস্য তিরস্কার করলে—ছি! ছি!